بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

সংখ্যা
3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 19 জানুয়ারী, 2017 19 সুলাহ ,1396 হিজরী শামসী 20 রবিউস সানী 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আমার মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন রহিয়াছে। যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে এই দুইটি নিদর্শণ অন্য কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ও রসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ উহার প্রথম রাত্রিতে হইবে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ তারিখে এবং সূর্য গ্রহণ উহার দিনগুলির মধ্যে মধ্যম দিনে হইবে

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

২য় নিদর্শনঃ

সহী দারকুতনীতে এই একটি হাদীস আছে যে, ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলিয়াছেন।

انّ لمهدينا اٰيتين لم تكونا منذ خلق السموات والارض ينكسف القمر لاوّل ليلةٍ من رمضان وتنكسف الشمس فى النصف منه۔

অর্থাৎ আমার মাহদীর জন্য দুইটি নিদর্শন রহিয়াছে। যখন হইতে খোদা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতে এই দুইটি নিদর্শণ অন্য কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি ও রসূলের সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ উহার প্রথম রাত্রিতে হইবে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ তারিখে এবং সূর্য গ্রহণ উহার দিনগুলির মধ্যে মধ্যম দিনে হইবে, অর্থাৎ একই রমযান মাসের ২৮ তারিখে। এইরূপ ঘটনা পৃথিবীর শুরু হইতে কোন রসূল বা নবীর যুগে কখনো প্রকাশিত হয় নাই। কেবল প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে ইহা হওয়া নির্ধারিত। সকল ইংরেজি ও উর্দু পত্রিকা এবং সকল দক্ষ জ্যোতির্বিদরা এই বিষয়ের সাক্ষী যে, আমার যুগেই, যাহার প্রায় ১২ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই নির্ধারিত চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ রমযান মাসে সংঘটিত হইয়াছে। যেরূপে অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রুপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবারাই এই তারিখগুলিতে হইয়াছে, যাহার প্রতি হাদীস ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহদী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পূর্বে খোদা তা'লা ইহা সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদশন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রাকাশিত হওয়ার পূর্বে এই সংবাদ বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।

বড়ই আক্ষেপ, আমার বিরুদ্ধবাদীরা কেবলমাত্র বিদ্বেষবশতঃ এই আপত্তি উত্থাপন করে। হাদীসের কথা এই যে, " চন্দ্র গ্রহণ প্রথম রাত্রিতে হইবে এবং সূর্য গ্রহণ মধ্যম দিনে হইবে; কিন্তু এইরূপ হয় নাই।" অর্থাৎ তাহাদের ধারণা অনুযায়ী "চন্দ্রগ্রহণ হেলালের রাত্রিতে হওয়া উচিত ছিল, যাহা চান্দ্র মাসের প্রথম রাত্রি। সূর্য গ্রহণ চান্দ্র মাসের পনেরতম দিনে হওয়া উচিত ছিল, যাহা মাসের মধ্যম দিন।" কিন্তু এই ধারণা কেবল মাত্র লোকদের না বোঝার ফল। কেননা, যখন হইতে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে চন্দ্র গ্রহণের জন্য খোদা তা'লার বিধান তিনটি রাতকে নির্ধারিত করিয়াছে, অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ। খোদা তা'লার বিধান অনুযায়ী সূর্য গ্রহণের জন্য তিন দিন নির্ধারিত আছে, অর্থাৎ চান্দ্র মাসের সাতাশ, আটাশ ও উনত্রিশতম দিন এবং সূর্যের তিন দিন গ্রহনের মধ্যে চান্দ্র মাসের দিক হইতে আটাশতম দিন মধ্যবর্তী দিন হয়। অতএব নির্দিষ্ট তারিখে হাদীসের বর্ণনানুযায়ী অবিকলভাবে রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয়। অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহণ রমযানের ত্রয়োদশ রাত্রিতে হইয়াছে এবং সূর্য গ্রহণ একই রমযানের আটাশতম দিনে হইয়াছে।

আরবী বাকধারায় প্রথম রাত্রির চাঁদকে কখনো 'কমর' বলা হয় না। বরং তিন দিন পর্যন্ত উহাকে 'হেলাল' বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহাকে সাত দিন পর্যন্ত 'হেলাল' বলিয়া থাকে। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যদি আমরা ধরিয়া লই চাঁদের প্রথম রাত্রির অর্থ ত্রয়োদশ রাত্রি এবং সূর্যের মধ্যম দিনে অর্থ আটাশতম দিন তবে ইহাতে অস্বাভাবিক কি ঘটনা ঘটিল? রমযান মাসে কখনো কি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয় নাই? ইহার উত্তর এই যে, এই হাদীসের অর্থ এই নহে যে, রমযান মাসে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই। বরং উহার অর্থ এই যে, রেসালত বা নবুয়তের কোন দাবীকারকের যুগে কখনো এই দুইটি গ্রহণ একত্রিত হয় নাই। হাদীসের বাহ্যিক শব্দসমূহও

এর পর সাতের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)- এর ঐতিহাসিক ভাষণ

(দ্বিতীয় কিস্তি)

পবিত্র কুরআনের সুরা ৪, আয়াত ১৩৬-এ বিষয়ে আমাদের সামনে এক সোনালী নীতি ও শিক্ষা পেশ করেছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে গিয়ে, এমনকি যদি আপনাকে নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, বা নিজ পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ও বন্ধুর, তবু আপনাকে অবশ্যই তাই করতে হবে। এটিই হল প্রকৃত ন্যায় যেখানে সার্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তি স্বার্থকে পরিত্যাগ করা হয়। যদি আমরা সমষ্টিগত পর্যায়ে এ নীতির বিষয়ে চিন্ত করি তাহরে আমরা উপলব্ধি করি যে, সম্পদ ও প্রভাবে বিচারে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষে লবিং করার কুটকৌশল পরিত্যাগ করা উচিত। এর স্থলে আন্তরিকতার সাথে এবং ন্যায় ও সাম্যের নীতি সমর্থন করার প্রয়াসে সকল দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও রাষ্ট্রদূতগণের এগিয়ে আসা উচিত। সর্ব প্রকার পক্ষপাতদুষ্টতা ও বৈষম্য আমাদেরকে নির্মূল করতে হবে, কেননা এটিই শান্তি বয়ে আনার একমাত্র মাধ্যম। যদি আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকাই , আমরা দেখি যে অনেক সময় সেখানে প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তৃতা ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু, এ প্রশংসাসমূহ অর্থহীন, কেননা প্রকৃত সিদ্ধান্ত যা হওয়ার তা পূর্বেই নির্ধারিত হয়েই রয়েছে।

অতএব যখন সিদ্ধান্ত সমূহ ন্যায় ও সত্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদলে, বড় বড় শক্তির চাপ বা লবির ভিত্তিতে গৃহিত হয় তখন এসব বক্তৃতা অর্থহীন, ফাঁকা বুলি সাব্যস্ত হয়, আর কেবল বাইরের জগতকে বিভ্রান্তকারী ছলনা হিসেবে কাজ করে। যাহোক, এসবের অর্থ এ নয় যে, আমরা কেবল আশাহত হয়ে বসে থাকবো আর আমাদের সকল চেষ্টাকে পরিত্যাগ করব। বরং এর বিপরীতে, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, দেশের আইনের অধীনে থেকে, সবসময় সরকারকে যুগের চাহিদা সম্পর্কে স্মরণ করাতে থাকবো। আর সেই সকল গোষ্ঠি যাদের স্বার্থ এতে সংশ্লিষ্ট আছে তাদেরকেও যথাযথ পরামর্শ আমাদের প্রদান করতে হবে, যেন বৈশ্বিক পর্যায়ে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবল তখনই আমরা বিশ্বকে সেই শান্তি ও সম্প্রীতির নীড়ে পরিণত হতে দেখবো যার কামনা ও আকাঙ্খা আমাদের সবার।

সুতরাং, আমরা আমাদের প্রচেষ্টসমূহ পরিত্যাগ করবো না আর কখনো তা করা উচিত হবে না। যদি নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা সরব না হই তবে আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব যাদের একেবারেই কোন মূল্যবোধ বা নৈতিক মান নেই। আমাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাক বা না যাক, আর প্রভাব রাখুক বা না রাখুক, অন্যদেরকে শান্তির পথে আমাদেরকে আহ্বান করে যেতেই হবে। আমি সবসময় অত্যন্ত আনন্দিত হই যখন দেখি যে, ধর্ম ও জাতির ভিন্নতা সত্বেও, মানবীয় মূল্যবোধকে উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে এত মানুষ বিশ্বে শান্তি ও সহানুভুতি প্রতিষ্ঠার পথসমূহ সম্পর্কে শোনার, শেখার ও আলোচনা করতে এ অনুষ্ঠানে সমবেত হন। তাই আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি যেন নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাই এবং আশার সেই স্ফুলিঙ্গকে জীবিত রাখি যে, একদিন সেই সময় আসবে যখন সারা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন মানবীয় প্রচেষ্টাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন সর্বশক্তিমান খোদা মানবজাতির পরিণাম সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এর পূর্বে যে খোদা তা'লার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে শুরু করে আর মানবজাতিকে তাঁর দিকে এবং মানবজাতির অধিকার আদায়ের দিকে যেতে বাধ্য করে, অনেক মঙ্গলজনক হয় বিশ্বের মানুষ নিজেই এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি সচেতন হয়, কেননা যখন সর্বশক্তিমান খোদা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন তখন তাঁর প্রতাপান্বিত রোষ মানবজাতির উপর ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী রূপে আপতিত হয়।

আজকের পৃথিবীতে, খোদা তা'লার ফয়সালার এক ভীতিপ্রদ বহিঃপ্রকাশ হতে পারে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এরূপ এক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ কেবল বর্তমান প্রজন্মেরর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তত:, এর ভয়াবহ পরিণামসমূহ আগত প্রজন্মান্তরে প্রকাশিত হবে। এরকম এক যুদ্ধের বহুবিধ করুণ করুণ পরিণতির কেবল একটি হল, কেবল বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের উপর এর প্রভাব। আজ যেসব মারণাস্ত্র রয়েছে সেগুলো এত ধ্বংসাত্মক যে এর ফলস্বরূপ প্রজন্মান্তরে শিশুদের মারাত্মক জেনেটিক ও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম লাভের আশংকা রয়েছে।

জাপান সেই একক দেশ যা পারমানবিক যুদ্ধের বীভৎস পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একে নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এমনকি আজও যদি আপনি জাপান সফর করেন এবং এদেশের জনঘনের সাথে কথা বলেন, তবে তাদের চোখে-মুখে যুদ্ধের প্রতি তীব্র এক আতঙ্ক ও ঘৃণা আপনি দেখতে পাবেন। অথচ যে নিউক্লিয়ার বোমাগুলো সে সময় ব্যবহৃত হয়েছিল আর যা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়েছিল, তা আজকের দিনের ছোট রাষ্টের হাতেও যে পারমাণবি অস্ত্র রয়েছে তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

বলা হয় যে জাপানে ইতোমধ্যে সাতটি দশক অতিবাহিত হয়েছে, আজও নবজাতক শিশুদের মধ্যে পারমাণবিক বোমাগুলোর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যদি কাউকে গুলিও করা হয়, তবু কখনো চিকিৎসার ফলে তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু, যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে যারা আক্রমণে মুখে পড়বে তাদের এমন কোন সুযোগ থাকবে না। বরং আমরা দেখব যে মানুষ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে আর মূর্তির মত স্থির হয়ে জমে যাবে, আর তাদের ত্বক আস্তে আস্তে গলে পড়বে। পানীয় জল, খাদ্য, ফসলাদি সবকিছু তেজস্ক্রীয়তা দ্বারা আক্রান্ত হবে। এর বিষক্রিয়ায় কি ধরণের রোগের উদ্ভব হবে, আমরা কেবল তার কল্পনা করতে পারি। ঐ সকল স্থান যেখানে সরাসরি আঘাত হবে না আর যেখানে তেজস্ক্রীয়তার পরিমাণ কিছু কম হবে, এমনকি সেখানে রোগ-ব্যধির ঝুঁকি বেড়ে যাবে আর পরবর্তী প্রজন্মগুলোও অনেক বাড়তি ঝুঁকি বহন করবে।

সুতরাং যেভাবে আমি বলেছি, এমন যুদ্ধে ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল সেই যুদ্ধ ও নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটি প্রবহমান থাকবে। এই হল এমন এক যুদ্ধের প্রকৃত পরিণাম; আর এতদত্বেও এমন স্বার্থপর ও নিবোর্ধ লোকেরা রয়েছে, যারা তাদের এ আবিষ্কার নিয়ে অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করে, আর তাদের সৃষ্টিকে বিশ্বের জন্য এক উপহার স্বরূপ বর্ণনা করে।

সত্য হল, নিউক্লিয়ার শক্তি ও প্রযুক্তির তথাকথিত কল্যাণকর দিকগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং অবহেলা বা দূর্ঘটনার দরুণ ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যে এমন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেছি, যেমন আজকের ইউক্রেনের চেরনাবিল-এ ১৯৮৬ সালে সংঘটিত নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায়, আর গত বছর ভূমিকম্প ও সুনামীর পর জাপানে, যেখানে তাদেরকে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল, আর পুরো দেশটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন এমন ঘটনা ঘটে, তখন আক্রান্ত এলাকায় পুনরায় জনবসতি স্থাপন করাও কঠিন হয়ে যায়। তাদের নিজের মর্মবিদারক অভিজ্ঞতার কারণে জাপনীরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে তাদের ভীতি ও আতঙ্ক একেবারেই যথাযথ।

এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধে মানুষ নিহত হয়ে থাকে। আর তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান যোগদান করেছির তার সরকার এবং জনগণ পুরোপুরি সচেতন থেকে থাকবেন যে, তাদের কিছু মানুষ নিহত হবে। বলা হয়, জাপানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় যা তাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪%। যদিও আরো কয়েকটি দেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নিহতের হার অনেক বেশ হয়ে থাকবে, তবু জাপানী জনগণের মাঝে যুদ্ধের প্রতি যে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা আমরা লক্ষ্য করি ত অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে এর সহজ কারণ দু'টো নিউক্লিয়ার বোমা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে ফেলা হয়েছিল, আর যার ফলাফল তারা আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করছে ও বহন করে চলেছে। জাপান তার জনপদসমূহে তুলনামূলক স্বল্পসময়ের মধ্যে পুনরায় জনবসতি গড়ে তুলে তাদের মহত্ব ও কঠিন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আজ যদি পুনরায় নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহলে খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন কোন দেশের কিয়দংশ চির তরে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। সেগুলোর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

ক্রমশঃ.....

জুমআর খুতবা

অনেক মানুষ কতক পদধারী বা যারা পদধারী নয় এমন মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন বা তেমন, এ ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে, আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেননা এরা জামাতকে বদনাম করছে। কিন্তু এমন লেখক বা অভিযোগকারীদের অধিকাংশ তাদের পত্রেনিজের নাম লেখে না অথবা কাল্পনিক বা রূপক নাম ও ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবও নয়।

যে সমস্ত অভিযোগকারীরা নিজেদের নাম লেখে না বা ভুয়ো নাম লিখে থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, হয় এরা মুনাফিক বা কপটাচারী নতুবা তারা মিথ্যাবাদী।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, অন্যের প্রতি যারা ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করে,তা সে পদধারী হোক বা না হোক, তারা এটি তখন করে যখন তারা দেখে যে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ অন্যদের হাতে প্রভাবিত হতে যাচ্ছে। অতএব তদন্ত করার পূর্বে এটি দেখতে হয় যে, অভিযোগকারী কেমন।

নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে অভিযোগ করার তাদের এই আচরণ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি কাজ কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রথমে অভিযোগকারী সম্পর্কে তদন্ত কর।
কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিরুচি বা আকর্ষণ বা সামাজিক প্রভাবের অধীনে কারো কোন কথা অপছন্দনীয় মনে হলেও সে কথা যদি কুরআনী শিক্ষা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে সঠিক হয় তবে সেটি সঠিক। সে ব্যক্তির ভিতরে কোন দোষ বা ত্রুটি নেই।

অনেকেই ব্যক্তিগত অভ্যাস, স্বভাব বা প্রকৃতির অধিনে বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের কথা ধর্মের নামে হয়ে থাকলেও এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই।

কিছু কথা এমন রয়েছে যে ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। সাক্ষী যদি সামনে না আসে তবে সেই কথার কোন গুরুত্বই নেই। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো অভিযোগে তার বলা কথা অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে না। খোদা তা'লারনির্ধারিত নীতি অনুসারে অভিযোগের সিদ্ধান্ত হবে। যেখানে দুই সাক্ষীর প্রয়োজন সেখানে দুই সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে, যেখানে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে সেখানে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে বা হাজির করতে হবে। আর সেই অনুসারে তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। খোদার নির্দেশ অুনসারে আমরা আমাদের বিষয়াদির নিষ্পত্তি করব এবং সিদ্ধান্ত নিব। এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজের আমিত্ব এবং নিজের পছন্দের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি বানিয়েব্যবস্থাপনাকে এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে আমরা যেন বাধ্য না করি যে, আমাদের ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

মাননীয় শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেব,পিতা মাননীয় শেখ মাজীদ আহমদ সাহেব অব করাচী-এর শাহাদত বরণ।
মাননীয় শেখ আব্দুল কাদের সাহেব, পিতা মাননীয় শেখ আব্দুল করীম সাহেব দরবেশ কাদিয়ান-এর মৃত্যু।
মাননীয় তানভীর আহমদ সাহেব লোন নাসেরাবাদ কাশ্মীর- এর মৃত্যু। মরহূমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত** ২রা ডিসেম্বর, ২০১৬, **এর জুমুআর খুতবা (২ ফাতাহ, ১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অনেক মানুষ কতক পদধারী বা যারা পদধারী নয় এমন মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে যে, এরা এমন বা তেমন, এ ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে, আর সে শরীয়ত বিরোধী অমুক অপকর্ম করেছে, তাই তাৎক্ষনিকভাবে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কেননা এরা জামাতকে বদনাম করছে। কিন্তু এমন লেখক বা অভিযোগকারীদের অধিকাংশ তাদের পত্রেনিজের নাম লেখে না অথবা কাল্পনিক বা রূপক নাম ও ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দেয়। এমন লোকদের অভিযোগে স্পষ্টতই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না আর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভবও নয়। এভাবে কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর অভিযোগ আসে যে, আমি লিখেছিলাম, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। যদি ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে অনেক বড় অন্যায় হবে। এই বেনামী অভিযোগ করার ব্যাধি পাক-ভারতের লোকদের মাঝে বেশি দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ খুব কম বা বিরলই এসে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের বাইরের দেশ সমূহে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের মাঝেও অনেকের বা কতকের মাঝে এই ব্যাধি অর্থাৎ এমন বেনামী অভিযোগ করার ব্যাধি রয়েছে। আর এটি নতুন কিছু নয়, সব যুগেইএমন অভিযোগকারী লোক ছিল যারা এমন অভিযোগ করতো যেভাবে আজকাল কেউ কেউ আমাকে লেখে। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর খিলাফতকালেও আর খিলাফতে সালেসা এবং খিলাফতে রাবেয়ার যুগেও এমন অভিযোগকারী ছিল যারা বেনামী অভিযোগ করতো।

এমনই একটি অভিযোগের প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবা প্রদান করেছিলেন। যেহেতু এটি এমন লোকদের মুখ বন্ধ করার জন্য খুবই স্পষ্ট এবং উৎকর্ষ একটি খুতবাতাই আমি সেই খুতবার আলোকে আজকে কিছু বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

যে সমস্ত অভিযোগকারীরা নিজেদের নাম লেখে না বা ভুয়ো নাম লিখে থাকে তাদের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল, হয় এরা মুনাফিক বা কপটাচারী নতুবা তারা মিথ্যাবাদী। যদি তাদের মাঝে সৎসাহস এবং সততা থাকে তাহলে কোনকিছুর ক্ষেত্রে তাদের ভ্রুক্ষেপ করার কথা নয়। অঙ্গীকার তারা এটি করে যে, আমরা প্রাণ, সম্পদ, সময় ও সম্মান উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্ত ত থাকব। কিন্তু তাদের ধারণা অনুসারে যখন জামাতের সম্মান এবং মর্যাদার প্রশ্ন আসে তখনতারা নিজের নাম গোপন করা আরম্ভ করে যেন কোথাও তাদের সম্মান ও মর্যাদার হানি না হয়। অতএব যে শুরুতেই দুর্বলতা দেখাল তার বাকি মতামতও ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আসলে তোমরা তদন্ত করে নাও। আর প্রত্যেক বিবেকবান জানে যে, যেকোন তদন্তের জন্য কথা যে বলে বা কথা যে পৌঁছায় তার কথা শুনে তাৎক্ষনিকভাবে সেই বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ হতে পারে না আর হয়ও না। বরং এটি দেখা হয় যে, যে কথা বলছে বা কথা পৌঁছাচ্ছে সে নিজে কেমন। তার মাধ্যমেই তদন্ত আরম্ভ হয়। প্রথমে তার সম্পর্কে তদন্ত হবে যে, সে সকল প্রকার অন্যায় থেকে পবিত্র কিনা, সে নিজে কোন অন্যায়ে বা অপকর্মে লিপ্ত নয় তো? আর ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল নয় তো?অথবা এটি অনভিপ্রেত যে, সে নিজে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বল হবে এবং অন্যদের ওপর অপবাদ আরোপ করবে যে, এই ব্যক্তি এমন বা তেমন।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, অন্যের প্রতি যারা ভয়াবহ অপবাদ আরোপ করে,তা সে পদধারী হোক বা না হোক, তারা এটি তখন করে যখন তারা দেখে যে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থ অন্যদের হাতে প্রভাবিত হতে যাচ্ছে। অতএব তদন্ত করার পূর্বে এটি দেখতে হয় যে, অভিযোগকারী কেমন, সে কি মু'মিন নাকি ফাসেক? অভিযোগকারী সম্পর্কে যেহেতু জানা-ই নেই তাই এটিও বলা যাবে না যে, সে কোন শ্রেণীর মানুষ। অবশ্য এটি সম্ভব যে, কোন ব্যক্তি যদি এমন কথা লেখে যে বিষয়টি বাস্তবে জামাতের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে নিজস্বভাবে সেটির তদন্ত করা হয়। অনুরূপভাবে যদি এটিও জানা থাকে যে, অভিযোগকারী কে? তাহলে আমি যেভাবে বলেছি, প্র থমে সে ব্যক্তির নিজের আচার-আচরণ সম্পর্কে তদন্ত হবে। অনুরূপভাবে মানুষ নিজের মত করে যে সমস্ত কথা বলে বা বলেছে, সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কেও তদন্ত হবে যেন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি সত্য বলছে কিনা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআনী শিক্ষা হল,আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (সূরা আল্-হুজুরাত: ০৭)। যদি তোমাদের কাছে কোন ফাসেক বা বিশৃঙ্খলা পরায়ণ ব্যক্তি কোন অভিযোগ নিয়ে আসে আর কারো সম্পর্কে কোন খারাপ কথা বলে, তাহলে (প্রথমে যে কথা নিয়ে আসলো) তার সম্পর্কে তদন্ত কর, এরপর কোন বিহিতের ব্যবস্থা নাও। কিন্তু অভিযোগকারী প্রধানত নিজের নাম প্রকাশ না করে নিজেই অপরাধ করে, আবার বলে যে, তার কথা সেভাবেই গৃহিত হওয়া উচিত যেভাবে সে লিখেছে, আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিকভাবে শাস্তির ফরমান জারি করা হোক।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ফাসেক শব্দের অর্থ শুধু পাপাচারী বা লম্পটই নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষায় পাপাচারীকেও ফাসেক বলা হয়, কিন্তু অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে ফাসেক তাকেও বলে যে, নিজে রাগী বা রগচটা স্বভাবের, কথায় কথায় ঝগড়া আরম্ভ করে। ফিসক শব্দের একটি অর্থ হল এতায়াত বা আনুগত্য না করা, এতায়াত বা আনুগত্যের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। ফাসেক এমন ব্যক্তিকেও বলা হয় যে, অসহযোগ প্রদর্শন করে, যে লড়াকু এবং সহযোগিতা করে না। এছাড়া ফাসেক শব্দ সেই ব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃতহয় যে মানুষের তুচ্ছ দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরে। সেইসাথে এটিও মনে করে এবং বলে যে,সে যা বলেছে বা বর্ণনা করেছে সে অনুসারেদ্বিতীয় ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত। ক্ষমার কোন সুযোগ যেন না দেওয়া হয়। ত্বরাপরায়ণ ব্যক্তিকেও ফাসেক বলা হয়ে থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক আহমদী বন্ধু যিনি পুরোনো এক প্রবীণ নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু ছিলেন এবং যার নিষ্ঠায় কোন প্রকার সন্দেহ নেই কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ে চরম ফতোয়া প্রদানে অভ্যস্ত ছিলেন, তার সম্পর্কে বলেন,তার স্বভাবগত ব্যাধি ছিল তুচ্ছ বিষয়াদি সম্পর্কেও কুফরের নিচে কোন কথাই বলতেন না। কোন কথা বা দুর্বলতা দেখলেই তাৎক্ষনিকভাবে কুফরি ফতোয়া প্রদান করে বসতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি বলেন যে, মানুষ যখন তাশাহ্হুদ বা আত্তাহ্যিয়াত এ বসে, তখন ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো সোজা রাখতে হয় কেননা সোজা রাখার নির্দেশ রয়েছে। যে সোজা রাখে না, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি কুফরীর মত অপরাধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর গেঁটেবাত-এর অসুবিধা ছিল। তিনি বলেন, আমি তাশাহ্হুদ এ বসা অবস্থায় ডান পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখতে পারি না। পূর্বে রাখতাম, যখন পা সুস্থ্য ছিল। যদি হাফেয সাহেব, সেই ব্যক্তি হাফেয ছিলেন, জিবীত থাকতেনতাহলে হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধেও তিনি কুফরী ফতোয়া জারি করে বসতেন। অতএব এমন মানুষও রয়েছে। আর তা এই অপরাধে যে, এই ব্যক্তি পায়ের আঙ্গুল সোজা রাখে না, আর এমনটি করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত পরিপন্থি কাজ। অতএব বোঝা গেল, রসূলে করীম (সা.)-এর সুন্নতে তার ঈমান নেই। এখন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতে যদি ঈমান না থাকে তাহলে কুরআনেও ঈমান নেই। আর কুরআনে যদি বিশ্বাস না থাকে তাহলে আল্লাহ্র সত্তায়ও বিশ্বাস নেই, অতএব কাফের হয়ে গেল। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এমন ত্বরাপরায়ণ লোকদের এই দৃষ্টান্তই দিয়েছেন, তারা নিষ্ঠাবানই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের নামও গোপন করে আবার ঈমানের ক্ষেত্রেও দুর্বল আর অন্যদের বিরুদ্ধে ফতোয়াও প্রদান করে বসে, এমন মানুষ তো ফাসেক শব্দের যত অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে সকল অর্থের নিরিখেই ফাসেক গণ্য হয়।

অতএব যারা নাম লেখে না এমন সকল অভিযোগকারীদের সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, নিজেদের পরিচয় প্রকাশ না করে অভিযোগ করার তাদের এই আচরণ কুরআনী নির্দেশের পরিপন্থি কাজ কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, প্রথমে অভিযোগকারী সম্পর্কে তদন্ত কর। তদন্ত না করে যদি শুধু অভিযোগকারীর কথা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়, যার সে দাবি করে, তাহলে জামাত উন্নতির পরিবর্তে ক্রমশঃ অবনতির শিকার হবে। খলীফায়ে ওয়াক্তেরও এবং জামাতের ব্যবস্থাপনারও নিজের কোন তদন্ত থাকবে না। যে ব্যক্তি যা-ই বলবে সে অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। আর এই বিষয়টি উন্নতির কারণ হতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তখন দাঁড়িয়ে এটি বলবে যে, আমার ইচ্ছা অনুসারে সিদ্ধান্ত করা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমারা যদি জানি যে, অভিযোগকারী ব্যক্তি খুবই সাবধান, সৎ, নিষ্ঠাবান, আর সে যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাহলে সবকিছু জানার পরও অবশ্যই তার তদন্ত করতে হবে এবং তদন্ত হবে। আমি যেমনটি বলেছি, যদি এই বিষয়টি নিশ্চিতও হয় যে, অভিযোগকারী পুণ্যবান, সৎ, ভুল করে না, তাসত্ত্বেও সেই বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা হবে এবং ব্যক্তি সম্পর্কেও তদন্ত হবে। কেননা কোন ব্যক্তি এই কথা বলার অধিকার রাখে না যে, আমি যেহেতু এটি বলছি তাই এমনই ধরে নেওয়া উচিত আর সে অনুসারেই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

তিনি বলেন, রসূলে করীম (সা.) একবার নামায পড়াচ্ছিলেন। নামায চলাকালে কোন ভুল হয়ে যায়। হযরত আলী (রা.) তখন মুক্তাদিদের মাঝে ছিলেন। তিনি তিলাওয়াতের সময়ে ভুল হওয়ার কারণে লোকমা দেন বা স্মরণ করানোর চেষ্টা করেন। রসূলে করীম (সা.) তা পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) তাকে(রা.) বলেন, তোমাকে মাঝখানে লোকমা দিতে কে বলেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই অপছন্দের একটি কারণ এটি হতে পারে যে, তোমার জন্য আরো অনেক বড় কাজ নির্ধারিত আছে, এসব ছোট ছোট কাজ অন্যদের জন্য থাকতে দাও। আর এটিওএকটি অর্থ হতে পারে যে, এ কাজ সেসব ক্বারীদের যারা মহানবী (সা.)-এর কাছে কুরআন শিখতেন, তুমি এ কাজ তাদের জন্যই থাকতে দাও।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর কাছে বেনামী এই অভিযোগকরী সম্পর্কে বলেন, সেই অভিযোগকারী কোন সম্মানিত ব্যক্তি হয়ে থাকলে আমি তাকে বলতে পারি যে, তুমি এ সব কাজ অন্য কারো জন্য ছেড়ে দাও আর নিজের আসল কাজের প্রতি মনোযোগী হও। তাই সেই পত্রের লেখক নিজের নাম প্রকাশ না করার কারণে তার মর্যাদা এবং অবস্থ ান সম্পর্কে জানা সম্ভব নয় আর তাকে বোঝানোও যেতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সেই অভিযোগকারী অনেক পদধারী, নাযের এবং মহিলাদের উপরও অপবাদ আরোপ করা আরম্ভ করে, অনেক ভ্রান্ত অপবাদ আরোপ করতে থাকে আর বলে যে, অমুক অমুক ব্যক্তির ভিতরে এই এই দোষ রয়েছে। এক দিকে সে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে, তারা কুরআন এবং মহনবী (সা.)-এর শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে।যেহেতুমহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করাই অনেক বড় একটি দোষ, তাই অনেক তারা বড় অপরাধে অপরাধী। যদি কোন মুসলমান কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা পরিপন্থি কোন কাজ না করে তাহলে তার অর্থ হল তার ভিতরে সে দোষ বা অপরাধ নেই। কিন্তুকেউ যদি তা করে থাকে তবে সেই অপরাধে সেই ব্যক্তি অপরাধী বা তার মাঝে সেই দোষ রয়েছে। যাহোক, অভিযোগকারী একদিকে বলছে যে, এরা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করছে আর অপরদিকে সে নিজেই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা এবং কুরআনী শিক্ষার বিরোধি কাজ করে,কেননা অভিযোগ এবং অভিযোগ প্রমাণের যে শর্ত কুরআন এবং সুন্নত নির্ধারণ করেছে সে নিজেই সেগুলো লঙ্ঘন করছে। অধিকাংশ মানুষ এমনই করে। যারা আমাকে লিখে তারা নিজেরাই এ শর্তগুলোকে ভঙ্গ করে। আসল বিষয় হল, কুরআনের শিক্ষা এবং সুন্নত অনুসরণ করা। আর কুরআন এটি বলে যে, কথা যখন বলা হয় তখন তার প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। আর নামই যেখানে প্রকাশ করা হচ্ছে না সেখানে তদন্ত কিভাবে করা যেতে পারে? এটি কুরআনী শিক্ষার স্পষ্ট পরিপন্থি বিষয়, তাই অভিযোগকারী স্বয়ং কুরআনী শিক্ষাকে লঙ্ঘন করে, কুরআনী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শ ন করে। কুরআনী শিক্ষা এবং রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করাই নেকী এবং পুণ্য, এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিরুচি বা আকর্ষণ বা সামাজিক প্রভাবের অধীনে কারো কোন কথা অপছন্দনীয় মনে হলেও সে কথা যদি কুরআনী শিক্ষা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে সঠিক হয় তবে সেটি সঠিক। সে ব্যক্তির ভিতরে কোন দোষ বা ত্রুটি নেই।

অনেকেই ব্যক্তিগত অভ্যাস, স্বভাব বা প্রকৃতির অধিনে বা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হয়ে কোন কোন বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের কথা ধর্মের নামে হয়ে থাকলেও এগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। এই বিষয়টির ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এটি এমন একটি ঘটনা যা পূর্বেও বেশ কয়েকবার বিস্তারিতভাবে শোনানো হয়েছে, এখন এ প্রে ক্ষাপটে বিষয়টি পুনরায় উপস্থাপিত হচ্ছে। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে সাথে নিয়ে স্টেশনে পায়চারি করছিলেন। সে দিনগুলোতে পর্দার দৃষ্টিভঙ্গী বড় কঠোর ছিল, কঠোরভাবে পর্দা করা হত। যারা খানদানি বা সম্ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত হত তাদের মহিলারা পালকিতে করে স্টেশনে আসত আর তার ডানে-বামে চাদর লাগানো থাকত এবং ট্রেনের বগি পর্যন্ত সেভাবেই আবদ্ধ অবস্থায় আসত।এরপর সেই বগিতেই তাদেরকে স্থানান্তর করা হত। এমন কঠোর পর্দা পালন করা হত। আর বগিতে বসার পর জানালাও বন্ধ করে দেওয়া হত যেন কারো চোখ মহিলাদের উপর না পড়ে। এরূপ পর্দা যাতনার কারণ ছিল এবং ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থিছিল। পক্ষান্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করতেন। হযরত উম্মু ল মু'মিনীন বোরকা পরিধান করতেন এবং ভ্রমণের জন্য বাহিরে বেরিয়ে পড়তেন। সে দিনও হযরত উম্মু ল মু'মিনীন (রা.) বোরকা পরিহিতা ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার সাথে প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে ছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের স্বভাবে তড়িঘড়ি কিছু করে ফেলার অভ্যাস ছিল। তিনি ভাবলেন, এটি অন্যায় কাজ হচ্ছে। তার নিজের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কিছু বলার সাহস ছিল না। তাই তিনি খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে যান এবং বলেন, এটি বড় ঝুকিপূর্ণ কাজ হচ্ছে, আগামীকাল পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ পড়ে যাবে আর বিজ্ঞাপন এবং নিবন্ধ ছাপানো হবে যে, মির্যা সাহেব প্লাটফর্মে নিজের স্ত্রীর সাথে পায়চারি করছিলেন। তাই আপনি গিয়ে মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বোঝান। খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এতে কোন অসুবিধা আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি যদি কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন তবে নিজেই গিয়ে বলতে পারেন। যাহোক, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যান, তিনি পায়চারি করতে করতে অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মাথা নিচু করে ফিরে আসেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আমার জিজ্ঞেস করার আগ্রহ জাগে যে, তিনি কী উত্তর পেয়েছেন, তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৌলভী সাহেব! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কী বলেছেন? মৌলভী সাহেব বলেন, আমি যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বললাম যে, এটি আপনি কী করছেন, মানুষ কী বলবে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন , কী আর বলবে? সর্বোচ্চ এটিই বলবে যে, মির্যা সাহেব তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। মৌলভী সাহেব লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন পর্দা পরিহিতা ছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে পায়চারি করা কোনভাবেই আপত্তির কারণ হতে পারে না। মহানবী (সা.)ও নিজ স্ত্রীদের সাথে এভাবে ঘুরাফেরা করতেন। একবার প্রকাশ্যে রসূলে করীম (সা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। রসূলে করীম (সা.) প্রথমবার পিছিয়ে থাকেন এবং হযরত আয়েশা (রা.) জিতে যান। কিছুকাল পর দ্বিতীয় বার দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয় আর রসূলে করীম (সা.) বিজয়ী হন এবং হযরত আয়েশা (রা.) পরাজিত হন। রসূলে করীম (সা.) বলেন, 'ইয়া আয়েশা!তিলকা বে তিলকা' অর্থাৎ হে আয়েশা! প্রথম পরাজয়ের বদলে তোমার এই পরাজয়। রসূলে করীম (সা.) স্ত্রীদের সাথে ঘুরাফেরাকে অপছন্দনীয় মনে করতেন না, আর ইসলাম যে কাজের অনুমতি দিয়েছে সেটিকে কোনভাবে অপছন্দনীয় বলা যেতে পারে না। অতএব কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারো ওপর আপত্তি করে সেক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ করছে না।

তিনি (রা.) পুনরায় সেই অভিযোগকারী সম্পর্কে বলেন, সে ব্যক্তি পত্রে লিখেছে যে, অমুক ব্যক্তি ইতর, অতএব এখানে ব্যক্তিগত আপত্তি বা বংশগত আপত্তি আরম্ভ হয়ে গেছে যে, অমুক ব্যক্তি নীচ, তাকে অমুক পদ দিয়ে রেখেছেন।এছাড়া আরো এমন কিছু অপবাদ আরোপ করা হয়েছে যা সম্পর্কে শরীয়ত সাক্ষী দাবি করে, আরতা-ও চাক্ষুস সাক্ষী হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ শরীয়ত এ সম্পর্কে বলে যে, চার ব্যক্তি যদি ঘটনা চাক্ষুস দেখে থাকেতাহলে অভিযোগ সত্য হিসেবে মেনে নেয়া হবে, তা না হলে নয়। অনেকে এমনিতেই কারো সাথে কারো অবৈধ সম্পর্কের অপবাদ আরোপ করে। কোন ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ যদি আনতে হয় তাহলে ইসলাম চার সাক্ষীর শর্ত রেখেছে। তিনি বলেন, অদ্ভুত বিষয় হল ধর্মীয় আত্মাভিমান এমন ব্যক্তির হৃদয়ে দানা বেধেছে যে স্বয়ং ইসলামী শিক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে আর অন্যদের উপর এমন অপবাদ আরোপ করে যা আরোপ করতে পবিত্র কুরআন নিষেধ করেছে, আর শুধু নিষেধই করে নি বরং এমন অপবাদের জন্য শাস্তি দেয়ারও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অন্যায় অপবাদ আরোপকারী যারা এমন কথা বলে তাদেরকে ৮০টি চাবুকাঘাত করতে বলা হয়েছে।অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কেশরীয়ত এত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে সে এটিকে লঙ্ঘন করে, আবার বলে যে, অমুক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে। অথচ এ ব্যক্তি নিজেই কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, দেখ! এই অভিযোগকারীর অবস্থান কী হল? প্রথমত এ ব্যক্তি নিজের নাম প্রকাশ করে নি এবং এরপর প্রয়োজনীয় প্রমাণাদিও উপস্থাপন করে নি। আমিও শরীয়তের বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে নই আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও শরীয়তের বিধি-নিষেধের বাহিরে নন। রসূলে করীম (সা.) স্ব য়ং শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য ছিলেন। অতএব, সে ব্যক্তি এমন কিছু আপত্তি করেছে যার জন্য শরীয়ত শাস্তি প্রস্তাব করেছে। আর শরীয়ত সাক্ষ্য উপস্থাপনের যে রীতি শিক্ষা দিয়েছে সে রীতি অনুসরণ করা আবশ্যক। কিন্তু সে বলে যে, অমুক ব্যি ক্ত অমুক কুরআনী শিক্ষাকে লঙ্ঘন করেছে, তাই তাকে শাস্তি দাওকিন্তু আমাকে কিছু বলবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শৈশবের একটি ঘটনা বা কৌতুক আমার মনে আছে। তখন আমি এটি খুব উপভোগ করতাম। আজও এটি স্মরণ হলে আমার হাসি পায়। তিনি বলেন, তখন আমি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম। আমাদের শিক্ষক এ নীতি নির্ধ ারণ করে রেখেছিলেন যে, তার প্রশ্নের উত্তর যে ছাত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দিতে সক্ষম হত সে উপরে এসে যাবে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, শিক্ষক প্রশ্ন করেন। এক ছাত্র এর উত্তর দেয়। দ্বিতীয় ছাত্র হাত উঠিয়ে বলে, শিক্ষক মহাশয়! এ উত্তর ভুল। শিক্ষক প্রথম ছাত্রকে বলেন, তুমি নিচে নেমে যাও আর দ্বিতীয় ছাত্রকে বলেন, তুমি উপরে চলে আস। নিচে যেতেই সেই ছাত্র যে পূর্বে উপরের নম্বরে ছিল সে বলে যে, শিক্ষক মহাশয়! সে আমার ভুল নির্ণয় করতে গিয়ে 'গালাত' শব্দটিকে উচ্চারণ করতে গিয়ে গল্ত্বলেছে যা একটি ভুল উচ্চারণ। শিক্ষক পুনরায় তাকে পূর্বের জায়গায় দন্ডায়মান করেন এবং দ্বিতীয় ছাত্রকে আবার নিচে পাঠিয়ে দেন। তিনি বলেন,অতএব কতক আপত্তিকারীর অবস্থা এমনই হয়ে থাকে, তারা অন্যদের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত বা সঠিক আপত্তি করে থাকে কিন্তু আপত্তি করার রীতিটি অন্যায় হয়ে থাকে। আর এভাবে তাকে শাস্তির মুখোমুখি করতে গিয়ে নিজেরাই শাস্তিযোগ্য হয়ে যায়। আর এরপর হৈ চৈ করে যে, অপরাধীকে কেউ কিছু বলে না, যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অথচ শাস্তিদাতারা কী করবে? তারাও শরীয়তেরই দাস। যদি কুরআনী অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চাও তবে নিজের জীবনেও কুরআনী অনুশাসনকে শিরোধার্য কর। যদি এটি চাও যে, অন্যদের উপর খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক আর তোমাদের উপর তা প্রতিষ্ঠিত না হোক তাহলে এ মনোবৃত্তি সঠিক নয়। তাই আমি অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্যে বলব, 'আইয়্যায কাদরে খুদ বেশানাস'অর্থাৎ হে আইয়্যায! নিজের অবস্থান এবং মর্যাদাকে প্রথমে স্মরণ রাখ এবং বোঝার চেষ্টা কর। যারা নিজেদের নাম প্রকাশ করে না তারা নিজেদের নাম গোপন রেখে অন্যদের উপর অপবাদ আরোপ করে যে, এদের কোন মর্যাদাই নেই আর অপবাদের পক্ষে এই প্রমাণ তারা তুলে ধরে যে, সে অমুক বংশের লোক, তার কোন অবস্থান নেই এবং সে এমন। অথচ এমন অপবাদের কোন ভিত্তি বা গুরুত্বই নেই। আর এর ফলে অপবাদ আরোপকারীরা নিজেরাই আসলে গুরুত্বহীন বা নীচ বা হীন হয়ে থাকে। আমাদেরকে খোদার নির্দেশ অনুসারে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও প্রভু-প্রতিপালক এবং সবার প্রভু-প্রতিপালক, সবারই তিনি জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করেন, লালন-পালন করেন। যেখানে সব কিছু আমরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নিচ্ছি তাই অপবাদ আরোপকারীর কথা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার কথাই আমাদের মানতে হবে। আমি যেমনটি বলেছি, অভিযোগকারীরা চায় যে, অন্যদেরকে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি দেওয়া হোক আর নিজেদেরকে তারা শরীয়তের নির্দেশের বাহিরে নিয়ে যায়, নিজেদেরকে শরীয়তের শিক্ষার ঊর্ধ্বে মনে করে। নিজেরাই নিজেদের বিচারক সাজে। অতএব, কথা যখন সামনে আসবে এবং স্পষ্ট হবে তখন তারাও শরীয়তের শিক্ষা অনুসারেই শাস্তি পাবে।

কিছু কথা এমন রয়েছে যে ক্ষেত্রে সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। সাক্ষী যদি সামনে না আসে তবে সেই কথার কোন গুরুত্বই নেই। আর শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে সেই বিষয়ের সিদ্ধান্ত তখনই হবে।

অনেক সময় বলা হয় যে, সে মিথ্যা কসম খেয়ে শাস্তি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর দরবারে একবার এমন বিষয় উপস্থাপিত হয়। দু'জন বিতন্ডাকারী আসে, রসূলে করীম (সা.) বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে এক পক্ষ কসম খাবে। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, এ তো মিথ্যাবাদী, সে একশ' মিথ্যা কসমও খেয়ে যেতে পারে। তিনি (সা.) বলেন, আমি খোদার নির্দেশ অনু সারে সিদ্ধান্ত নিব। সে যদি মিথ্যা কসম খায় তাহলে তার বিষয়টি খোদার হাতে, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে শাস্তি দিবেন।

(খুতবাতে মাহমুদ,৩৩তম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৬৫ থেকে সংকলিত)

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো অভিযোগে তার বলা কথা অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে না। খোদা তা'লারনির্ধারিত নীতি অনুসারে অভিযোগের সিদ্ধান্ত হবে। যেখানে দুই সাক্ষীর প্রয়োজন সেখানে দুই সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে, যেখানে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হবে সেখানে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে বা হাজির করতে হবে। আর সেই অনুসারে তদন্ত হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে। খোদার নির্দেশ অুনসারে আমরা আমাদের বিষয়াদির নিষ্পত্তি করব এবং সিদ্ধান্ত নিব। এতেই আমাদের সাফল্য নিহিত। নিজের আমিত্ব এবং নিজের পছন্দের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি বানিয়েব্যবস্থাপনাকে এবং খলীফায়ে ওয়াক্তকে আমরা যেন বাধ্য না করি যে, আমাদের ইচ্ছানুসারে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অভিযোগকারীদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন। তারা যদি কোন কিছুকে সঠিক মনে করে তাহলে সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদিসহ পরিষ্কারভাবে অভিযোগ করা উচিত, যেখানে নাম ঠিকানাও থাকবে আর তদন্তে তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎতদন্তের আওতায় তারাও থাকবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি দেখে যে, বাস্তবিক পক্ষেই জামাতের ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্তহচ্ছে এমন ক্ষেত্রে বীরত্বের সাথে সামনে আসা উচিত, অভিযোগ করা উচিত আর এরপর সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের ব্যবস্থাপনাকেও তৌফিক ও বিবেক-বুদ্ধি দান করুন, খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব যাদের হাতে ন্যাস্ত করা হয়েছে তারাও যখন সিদ্ধান্ত করেন তখন যেন ইনসাফ বা ন্যায় বিচারের প্রতিটি দিক সামনে রেখে আর খোদার নির্দেশ অনুসারে এবং সুন্নতের অনুসরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হয়ে থাকে।

নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা হবে এক শহীদ শ্র দ্ধেয় শেখ সাজেদ মাহমুদ সাহেবের। পিতার নাম হল শেখ মজিদ আহমদ সাহেব। মরহুমের বয়স ছিল ৫৫ বছর। তিনি করাচীর গুলজার হিজরী হালকায় বসবাস করতেন। বিরোধীরা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ সনে মাগরিবের নামাযের পর ঘরের বাহিরে গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলি করে তাকে শহীদ করে । ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অনুসারে শেখ সাজেদ মাহমুদ । সাহেব করাচীর শালিমার-এ ময়দার কারখানায় স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের কাজ করতেন। ২০১৬ সনের ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাযের পর বাজার থেকে সওদা নিয়ে ফিরে আসেন। ঘরের বাহিরে গাড়িতে থাকা অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় মটর সাইকেল আরোহি ব্যক্তি তাকে লক্ষ্য করে চারবার গুলি করে।এরপর যাওয়ার সময় আরো চারবার গুলি করে এবং পালিয়ে যায়। একটি বুলেট তার বক্ষের ডান দিকে আঘাত করে আর পাজরে লেগে বাম দিক থেকে বেরিয়ে যায়। অপর একটি বুলেট তারপায়ে লাগে। সাজেদ মাহমুদ সাহেবকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর আগাখান হাসপাতালে স্থ ানান্তরীত করা হয়, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষা হয় নি এবং চিকিৎসা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে তার বড় দাদা জনাব শেখ ফজল করীম সাহেবের মাধ্যমে। ১৯২০ সনে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুমের পিতা শেখ মজিদ আহমদ সাহেব পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের কানপুর থেকে হিজরত করে লাহোরে স্থানান্তরীত হন। পরবর্তীতে ১৯৬১ সনে তিনি করাচী হিজরত করেন। মরহুমের দাদা জনাব খাজা মোহাম্মদ শরীফ সাহেব দীর্ঘ দিন লাহোরের দেহলী দরজা জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার বড় নানা হযরত আলাদীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে কোলকাতার মরহুম সেঠ সিদ্দিক বাণী সাহেব শহীদ মরহুমের স্ত্রীর নানা। শহীদ মরহুম বি.এ পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। পাঁচ বছর কষ্টদায়ক পরিস্থিতির মাঝে জীবন অতিবাহিত করার পর তিনি আটার মিলের স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের ব্যবসা আরম্ভ করেন, যাতে আল্লাহ্ তা'লা প্রভূত বরকত দান করেন। এরপর তিনি এই ব্যবসাই অব্যাহত রাখেন। শহীদ মরহুমের পুত্র হারেস মাহমুদ সাহেব, নায়েব কায়েদ এবং করাচীর গুলশান ইকবাল-এর সেক্রেটারী ওসীয়্যতও বটে। তার পুত্র পড়ালেখার শেষে'এসিসিএ' করার পর পিতার সাথেই তার ব্যবসায় যোগদেন। শহীদ মরহুম বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন। অনুরূপভাবে শহীদের কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা করাচীতে পড়ালেখা করছেন। তিনি ৬ মাসের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগও লাভ করেছেন এবং সেখান থেকে একটি শর্ট কোর্স করে এসেছেন। মরহুমের খিলাফতের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা এবং গভীরসম্পৃক্ততা ছিল। সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খিলাফত এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহত করতেন। চাঁদায় উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ

নিতেন। ছেলেকেও এই বিষয়ে নসীহত করতেন। চাঁদা প্রদানের বিষয়ে তিনি সব সময় সোচ্চার থাকতেন। চাঁদার জন্য দোকানে একটি পৃথক ব্যাংক রেখেছিলেন যাতে তিনি চাঁদার টাকা জমা করতেন।লেনদেনের ক্ষেত্রে খাঁটি ছিলেন, সত্যকে অগ্রগণ্য রাখতেন। মার্জনাকারী ছিলেন। ভাই-বোনদের সাথে সব সময় স্নেহপূর্ণ আচরণ করেছেন, কখনো কারো প্রতি রাগান্বিত হতেন না। তিনি পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী স্বচ্ছ এক মানুষ ছিলেন।রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার দু'টি দোকানের নাম মরহুম পিতা এবং শ্বশুরের নামে রেখেছিলেন। স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে তিনি অনুকরণীয় উত্তম ব্যবহার করতেন। বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্বচ্ছ হৃদয়ে সাক্ষাৎ করতেন। হিংসা-বিদ্বেষ তার হৃদয়ে আদৌ ছিল না। বিভিন্ন মানুষ যা লিখেছে সেই সব কথার সারাংশ তাই যা আমি শহীদের গুণাবলী হিসেবে তুলে ধরেছি। শহীদ মরহুমের মাতা আজকাল খুবই অসুস্থ, তার অসুস্থতার কারণে ছেলের শাহাদাত সম্পর্কে তাকে জানানো কঠিন ছিল কিন্তু তিনি যখন তা জানতে পারেন এবং ছেলের মৃতদেহ দেখেন তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠেন, আমার ছেলে শহীদ, কেউ কাঁদবে না বা অশ্রুপাত করবে না। আর এই বাক্য তিনি বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করেন। শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী অত্যন্ত বীরত্বের সাথে স্বামীর শাহাদাতের ঘটনা শুনেন এবং সুমহান ধৈর্য্য প্রদর্শন করেন। তার পুত্র বলেন, আমার পিতার স্বভাব ছিল খুবই ধীর এবং স্থীর। আল্লাহ্‌র সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল ছিল, বারবার এটিই বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অনেক সম্মান দিয়েছেন এবং এত সম্মান দিয়েছেন যে, আমি নিজেও তা ভাবতে পারি না। রীতিমত ইবাদত করতেন এবং ইবাদতে খুবই নিয়মানুবর্তী ছিলেন। মরহুমের আত্মীয়-স্বজনরা বলেন, খুবই সরল প্রকৃতির, সহানুভুতিশীল এবং বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মরহুমের এগারজন ভাই-বোন ছিলেন। তাদের সবার স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। শহীদ মরহুম তাদের সবার দেখাশুনা করতেন এবং সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন। সাক্‌খারে যখন জামাতী দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থার অবনতিহয় এবং শাহাদাতের ঘটনা ঘটেতখন শহীদ মরহুম সেখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন এক নাগাড়ে ডিউটি করতেন। তার মেয়ে বলেন, শাহাদাতের ঘটনার পর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, অনেক বড় একটি বাগানে বহু জ্যোতির্মন্ডিত চেহারার মানুষ বিদ্যমান। তাদের সবাই শুভ্র-সাদা পোশাক পরিহিত এবং আব্বুও সেখানে আছেন। তার মর্যাদা অনেক উঁচু। সবাই আব্বুকে পরিবেষ্টন করে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করছে। এরপর আমার পিতা একদিকে যাত্রা করেন আর সবাই কাফেলার রূপে সেদিকে অগ্রসর হয়। আর সবাই তার পিতাকে দেখে আনন্দিত ছিল। আমি যেমনটি বলেছি, শহীদ মরহুমের শ্রদ্ধেয়া মা দৈহিকভাবে খুবই দুর্বল,চলাফেরা করতে পারেন না। শাহাদাতের পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, শহীদ মরহুম তার মাকে সম্বোধন করে বলেন যে, আমি এখানে খুবই আনন্দিত এবং শান্তিতে আছি, আমার কারণে আদৌ দুশ্চিন্তা করবেন না। মরহুম ছেড়ে যাওয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী মনসুরা ইয়াসমিন, ছেলে শেখ হারেস মাহমুদ, কন্যা সানা মুবাশ্বেরা সাহেবা ছাড়াও চার ভাই এবং ছয় বোন রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তান-সন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা শ্রদ্ধেয় শেখ আব্দুল কাদির সাহেবের, পিতার নাম শেখ আব্দুল করীম। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৬ নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।তার বংশে আহমদীয়াত আসে হযরত আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব-এর মাধ্যমে যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। ১৯৪৭ সনে নভেম্বর মাসে যখন কাদিয়ান থেকে শেষ কাফেলা পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখনতিনি তার অসুস্থ মাকে সাপোর্ট দিয়ে ট্রাকে বসে ছিলেন, কাদিয়ানের সীমান্তের কাছে এসে তার মা তাকে কেন্দ্রের হেফাজতের জন্য ট্রাক থেকে নামিয়ে দেন, আর এভাবে দরবেশীর সৌভাগ্য লাভ হয় তার। খিলাফত ব্যবস্থা এবং জামাতের ব্যবস্থাপনার প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় পূর্ণ ভরসা ছিল আর সমস্ত সাফল্য এবং ব্যর্থতাকে খোদার সন্তুষ্টি মনে করে হাসি মুখে বরণ করতেন। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করতেন। শেষ বয়স পর্যন্ত নিজ হাতে কাজ করেন। সদর আঞ্জুমানেআহমদীয়া কাদিয়ানের বিভিন্ন অফিসের বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পেয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, আসন্ন জলসা সালানার উদ্দেশ্যে ঘরেরউজ্জলতার জন্য সিমেন্ট ইত্যাদি আনিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই রাতেই তিনি ডেকে বলেন যে, মনে হয় যেন আমার শেষ সময় সন্নিকটে, অমুক ব্যক্তি থেকে পাঁচশত রুপিয়া নিয়েছিলাম, সেই টাকা ফেরত দিতে হবে, এবং অন্যান্য হিসাব-কিতাবের কথা অবহিত করে স্বল্পক্ষণের মাঝেই ইহধাম ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।।তার ছেড়ে যাওয়া পরিবার-পরিজনে তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। মরহুমের ছেলে নাসির ওয়াহিদ সাহেব কাদিয়ানে জামাতের খিদমতের তৌফিক পাচ্ছেন।

তৃতীয় জানাযা তানভীর আহমদ লোন সাহেবের যিনি কাশ্মিরের নাসেরাবাদের অধিবাসী।তিনি পুলিশ বিভাগে ছিলেন। গত ২৫ নভেম্বর দায়িত্বপালনরত অবস্থায় জেলা হেডকোয়ার্টারে অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুকধারীদের গুলিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইনি শহীদের মর্যাদা রাখেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। শহীদ মরহুম নামায-রোযায় গভীরভাবে অভ্যস্ত, নেক হৃদয়ের অধিকারী, গরীবদের লালন-পালনকারী, বিশ্বস্ত, মানুষের জন্য কল্যাণকারী, আল্ল াহ্‌র ওপর ভরসাকারী ব্যক্তি ছিলেন, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। রীতিমত হার অনুসারে বর্ধিতহারে চাঁদা দিতেন। তার ছোট ভাই-বোনদের মন জয় করতেন, তাদের সাহায্য করতেন, তাদের পড়া-লেখার ব্যাপারে সব সময় সচেতন থাকতেন। প্রতিবেশীদের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশীর প্রাপ্য প্রদানকারী ছিলেন। তার বিভাগের সহকর্মীদের বিবৃতি হল, তার ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনে তিনি সব সময় সচেতন ও সোচ্চার থাকতেন। কখনো কোন আলস্য বা ঔদাসিন্য প্রদর্শন করতেন না। মরহুম ছেড়ে যাওয়া শোক সন্তপ্ত পরিবারে মা ছাড়াও ২ বোন, ৬ ভাই, স্ত্রী এবং ৩জন নিষ্পাপ শিশু রেখে গেছেন। তার এক পুত্র তাহরীকে ওয়াকফে নও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তার সন্তান-সন্ততিকে সব সময় জামাত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত ও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, এবং তিনি নিজেই তাদের তত্ত্বাবধানকারী হোন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

****

একের পাতার পর....

ইহার প্রমাণ বহন করিতেছে। যদি কাহারো এই দাবী থাকে যে, নবুয়ত বা রেসালতের কোন দাবীকারকের যুগে এই দুইটি গ্রহণ রমযান মাসে কখনো কোন যুগে একত্রিত হইয়াছে তবে ইহার প্রমাণ দেওয়া তাহার অবশ্য কর্তব্য। বিশেষতঃ এই বিষয়টি কাহার জানা নাই যে, ইসলামী সাল অর্থাৎ তেরশত বৎসরে কয়েক ব্যক্তি কেবল মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীও করিয়াছে, বরং যুদ্ধও করিয়াছে। কিন্তু কে প্রমাণ করিতে পারে যে, তাহাদের যুগে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ উভয়টি রমযান মাসে একত্রিত হইয়াছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রমাণ পেশ না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এই ঘটনা অস্বাভাবিক। কেননা, অস্বভাবিক উহাকেই বলা হয় যে, উহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। কেবল হাদীসই নহে, বরং কুরআন শরীফও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে وَخَسَفَ الْقَمَرُ-وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ আয়াত (সূরা আল কিয়ামা– আয়াত: ৯-১০, অর্থ: এবং চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে– অনুবাদক) দেখিয়া লও।

টীকা: খোদা তা'লা সংক্ষিপ্ত কথায় বলিয়া দিয়াছেন যে, শেষ যুগের চিহ্ন এই যে, একই মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ একত্রিত হইবে। এই আয়াতের পূর্বের অংশে বলা হইয়াছে এই সময় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীর পলায়নের কোন জায়গা থাকিবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রতিশ্রুত মাহদীর যুগে হইবে। সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যেহেতু ঐ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ খোদার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হইবে সেহেতু মিথ্যাবাদী প্রতিপন্নকারীদের উপর হুজ্জত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০২-২০৪

জুমআর খুতবা

যাদের চোখ পর্দাবৃত্ত, যারা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে, আমরা মানব না, ঐশী সমর্থন এবং নিদর্শনও তাদের চোখে পড়ে না। নবীদের যারা অস্বীকার করেছে তাদের চিরাচরিত রীতি হল, তারা নিদর্শনাবলী দেখার পরও বলে, আমাদের নিদর্শন দেখাও। তারা সীমাতিক্রম করায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। তারা সত্যকে আর পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই শিক্ষণী নিদর্শনে পরিণত করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের দাবির সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার অনেক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে আর রাসূলে করীম (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর কথাও উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি (সা.) এ সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যারমধ্যে থেকে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এ সব ধর্মীয় নেতারা নিজেরাও মানে নি আর মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছে এবং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশিত নিদর্শনাবলী সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

আমরা প্রতিদিন ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। ইন শা আল্লাহ্, সেই দিন অবশ্যই আসবে যখন এই দৃশ্য চোখে পরবে যে, জামাতে আহমদীয়া এত উন্নতি করবে যে, তখন অন্যান্য জাতির অবস্থা এবং অবস্থান খুবই নগন্য হবে কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি ও সঞ্চারিত করতে হবে যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এ দৃশ্য আমাদের উপহার দিবেন।

যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এসে থাকে সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামাতের সাথে সব সময় এমনটি হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

সম্প্রতি রাবওয়াতে তাহরীকে জাদীদের অফিসসমূহে এবং যিয়াউল ইসলাম প্রেসের উপর পুলিশ প্রশাসনের বিশেষ দলের তল্লাশি চালানো এবং আহমদী সদস্যদের আটক করার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা এ সব ঘটনায় ভীত হই না, আমাদের ঈমান দৃঢ় আছে, আমরা প্রতিটি দুর্যোগের মোকাবেলা করব এবং কুরবানী পেশ করব।

আল জেরিয়া-তে সরকারের পক্ষ থেকে অনেক জুলুম-নির্যাতন চলছে।

অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ! এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আমরা করব, ইনশাআল্লাহ্।

পাকিস্তানী মৌলবী হোক বা কোন ধর্মীয় নেতা অথবা কোন জাগতিক শক্তি খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই, তারা ভেড়ার পালের মত মানুষ। এরা কখনও আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না। কাজেই আহমদীয়তের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কেবল আমাদের মুবাল্লেগদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। উন্নতির অংশ হতে চাইলে আহমদীয়াতের প্রচার করুন। আর অবশ্যই আমাদেরকে এর অংশ হতে হবে। অতএব, আমাদের উচিত দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া। আধ্যাত্মিকতার উন্নতি আবশ্যক। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা আবশ্যক, এ বিষয়গুলোই আহমদীয়তের বিরোধিতার সমাপ্তির কারণ হবে আর আহমদীয়তের উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদেরও অবদান থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

ইন্ডোনেশিয়ার মোবাল্লেগ সিফনি যাফর আহমদ সাহেবের মৃত্যু। তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত ৯ই** ডিসেম্বর , ২০১৬, **এর জুমুআর খুতবা (৯ ফাতাহ , ১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,যাদের চোখ পর্দাবৃত্ত, যারা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে, আমরা মানব না, ঐশী সমর্থন এবং নিদর্শনও তাদের চোখে পড়ে না। নবীদের যারা অস্বীকার করেছে তাদের চিরাচরিত রীতি হল, তারা নিদর্শনাবলী দেখার পরও বলে, আমাদের নিদর্শন দেখাও। তারা সীমাতিক্রম করায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। তারা সত্যকে আর পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই শিক্ষণী নিদর্শনে পরিণত করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীরাও এরূপ ছিল, দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা বশতঃ তাদের চোখে কোন নিদর্শন পরত না। এরপর এমন অনেক আইয়েম্মাতুল কুফর অর্থাৎ কাফেরদের সর্দারই নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের দাবির সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার অনেক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে আর রাসূলে করীম (সা.)-এর নিদর্শনাবলীর কথাও উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি (সা.) এ সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যারমধ্যে থেকে এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এ সব ধর্মীয় নেতারা নিজেরাও মানে নি আর মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছে এবং এর ধারাবাহিকতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ সব নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)জামাতের সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যে সব নিদর্শনের কথা বলেছেন তা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূলে করীম (সা.)ও এ সবকে নিদর্শনই আখ্যা দিয়েছেন। তিনি এর কতকের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হল, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন। তিনি বলেন, যতদিন এদের নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করে নি মৌলভীরা কাঁদত এবং কেঁদে কেঁদে তারা হাদীস পাঠ করত আর এ নিদর্শন যখন পূর্ণতা লাভ করে যা কেবল একবার নয় দু'বার পূর্ণতা লাভ করেছে। এ দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে একবার পূর্ণতা লাভ করেছে আর একবার আমেরিকায়। এ পূর্ণতার পর যারা নিদর্শন দাবি করত তারাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারে নি, কেননা নিদর্শন তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হঠকারীতা এবং নাছোড় মনোবৃত্তি তাদের বাধ সাধে। তিনি বলেন আমার এক বন্ধু বলেছেন, এ নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করার পর এক মৌলভী, যার নাম গোলাম মোর্তুজা। চন্দ্রগ্রহণের সময় সে তার রানে হাত চাপরে দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, এখন পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেখ! সে কি বিশ্বসাবীর জন্য

আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে বেশি হিতাকাঙ্খী ছিল? অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্লেগের নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। কুরআনে খাল কাটার ভাবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। নতুন জনবসতী আবিষ্কার হওয়ার সংবাদ রয়েছে। পাহাড় বিদীর্ন করার সংবাদ রয়েছে। বই-পুস্তক এবং নতুন পত্রিকা, সাময়িকী আর নতুন বাহনের কথা তিনি বলেছেন। এক কথায় বহু নির্দশনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যার সংবাদ কুরআন শরীফেও রয়েছে আর রাসূলে করীম (সা.)ও দিয়েছেন।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৭-১৫৮ থেকে সংকলিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সমর্থন দেখার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর এমন সব তুচ্ছ ও অযৌক্তিক আপত্তি করে যা অদ্ভূত ও হাস্যষ্কর।তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপর্যুপরি নিদর্শন দেখিয়েছেন। কিছু মানুষ এমন আছে যারা এসে বলে, তাঁর পাগড়ি বাঁকা, ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? এমন আপত্তি করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন কিন্তু এমন কিছু মানুষ কাদিয়ান আসে যারা বলে, এ ব্যক্তি সঠিকভাবে ক্বাফ উচ্চারণ করতে পারে না ইনি কিভাবে মসীহ্ মওউদ হলেন। তিনি আয়াতের পর আয়াত দেখিয়েছেন কিন্তু এমন মানুষও এসেছে যারা বলেছে, তিনি স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার বানিয়েছে, তিনি বাদামের তেল ব্যবহার করেন, তাকে আমরা কিভাবে মানতে পারি? এই ছিল তাদের আপত্তি।তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখে তোমরা মুখ ফিরিয় নিও না, চোখ বন্ধ করে থেকো না। অনেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে বলত, কোন নিদর্শন দেখান। তিনি বলতেন, পূর্বের নিদর্শনাবলীকে কতটা কাজে লাগিয়েছ যে, এখন আরো নিদর্শন দাবি করছ? ইতিপূর্বে সহস্র সহস্র নিদর্শন থেকে যেখানে উপকৃত হও নি তখন অন্য কোন নিদর্শন দেখে কিভাবে লাভবান হবে? এমন মানুষ সব সময় বঞ্চনারই শিকার হয়।

(মালফুযাত, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৪-২২৫ থেকে সংকলিত)

এমন এক অসাধারণ নিদর্শন যা প্রতিদিন পূর্ণতা লাভ করে তা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন, অর্থাৎ ইলহাম হিসেবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করো না আর আমাকে এক জামাতে পরিণত কর। তিনি নিজেই এই অনুবাদ করেছেন। অন্যত্র বলেন, ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব। অর্থাৎ তোমার জন্য চতুর্দিক থেকে অর্থকড়ি ও সাজ -সরঞ্জাম যা অতিথিদের জন্য আবশ্যক আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা সরবরাহ করবেন। আর সব দিক থেকে তা তোমার কাছে আসবে। তিনি আরো বলেন, ইয়াতুনা মিনকুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব। সকল পথ এবং দিক থেকে তোমার কাছে অতিথিরা আসবেন।তিনি বলেন, এটি ২৬ বছর পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণী, যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখেছেন, যা আজ পর্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করছে। (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬১ থেকে সংকলিত) এটি জামাতের উন্নতি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী। আমরা দেখছি যে, আজও পর্যন্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। তাঁর জামাতের প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত উন্নতি করা, অর্থনৈতিক কুরবাণী করার ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতি করা, এটি তাঁর সত্যতার অসাধারণ একটি প্রমাণ এবং একটি নিদর্শন। কিন্তু কেবল সেই দেখে যার দেখার মত শক্তি আছে। অন্ধরা তো দেখার যোগ্যতা রাখে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতক ইলহামের প্রেক্ষাপটে যা আহমদীয়াতের বিজয় এবং জামাতের উন্নতির সাথে সম্পর্কযুক্ত সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা বার বার অবহিত করেছেন, জামাতে আহমদীয়াকেও সেভাবেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেভাবে পূর্বের নবীদের জামাতকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।একবার তিনি স্বপ্নে দেখেছেন, আমি নিজামুদ্দীরে ঘরে প্রবেশ করেছি। নিজামুদ্দীনের অর্থ হল, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। এ স্বপ্নের অর্থ হল, অবশেষে আহমদীয়া জামাত এক দিন ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় রূপ নিবে; আর পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমের উপর বিজয়ী হবে। এ বিজয় কিভাবে অর্জিত হবে? এ সম্পর্কে স্বপ্নে তিনি নিজেই বলে, আমরা এতে কিছুটা হাসানের পদ্ধতিতে প্রবেশ করব এবং কিছুটা হোসাঈনের পদ্ধতিতে প্রবেশ করব। সবাই জানে যে, হযরত হাসান (রা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা তিনি সমঝোতার মাধ্যমে অর্জন করেছেন আর হযরত হোসাঈন (রা.) সাফল্য পেয়েছেন শাহাদাতের মাধ্যমে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে জানানো হয়েছে, নিজামুদ্দীনের পর্যায়ে জামাত অবশ্যই পৌঁছবে কিন্তু তা কিছুটা প্রেম-প্রীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে আর কিছুটা শাহাদত এবং কুরবানীর পথ অতিক্রম করে। যদি আমাদের কেউ এটি মনে করে যে, মীমাংসা এবং সমঝোতার পথ না বেয়েই জামাত উন্নতি করবে তারা ভুল করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, ত্যাগ স্বীকার করা এবং শাহাদাত ছাড়াই এ জামাত উন্নতি করবে তারাও ভুল করে। কখনো মীমাংসা এবং শান্তির দিকে যেতে হবে, কখনো হোসাঈনের রীতি অবলম্বন করতে হবে। এর অর্থ হল, শত্রুর সম্মূখে আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও দিতে হবে কিন্তু তার কথা আমরা মানব না। এ উভয় রীতি আমাদের জন্য অবধারিত। কেবল ঈসার রীতি বা সহনশীলতা বা ধৈয্যের রীতি আমাদের জন্য অবধারিত নয়। আর না কেবল মাহদীর রীতি আমাদের জন্য নির্ধারিত। একটি মধ্যবর্তী পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। একটি বিজয় আসবে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পথ বেয়ে এবং আরেকটি বিজয় আসবে ত্যাগের রাজপথ অতিক্রম করে। এরপর জামাত নিজামুদ্দীনের গৃহে প্রবেশ করবে এবং জামাত সাফল্য অর্জন করবে। (তফসীরে কবীর ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৮৩ থেকে সংকলিত) এ উভয় কথার দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যা জামাতের সদস্যরা প্রদর্শন করছে। শান্তি এবং সমঝোতার বার্তাও আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং ধর্মের জন্য জামাত ত্যাগও স্বীকার করছে।

তিনি আরেক স্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে এবং তাঁকে দেখানো হয়েছে (পূর্বের ইলহামের কথা হচ্ছে) মসজিদে মুবারকের সন্নিবেশিত যে ঘর রয়েছে এটি ছিল নিজামুদ্দীনের ঘর, এতে আমরা কিছুটা প্রবেশ করব হাসান (রা.)-এর পদ্ধতিতে এবং বাকিটা হোসাঈন (রা.)-এর পথ অবলম্বন করে। অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভাবত, এই ইলহামের অর্থ কী? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওদউ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন জানা নেই এ ইলহামের অর্থ কী? কিন্তু যথা সময়ে ইলহামের অর্থ প্রকাশ পায়। (খুতবাতে ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯-৪০ থেকে সংকলিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সে যুগে যখন তাঁর সাথে কেউ ছিল না বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেছেন যে, তোমার জামাত এত উন্নতি করবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি তাদের মোকাবেলায় তেমনই হবে যেভাবে আজকের পুরনো যাযাবর জাতির অবস্থা।

(মিনহাজুত তালেবীন, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৩)

আমরা প্রতিদিন ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করি। ইন শা আল্লাহ্, সেই দিন অবশ্যই আসবে যখন এই দৃশ্য চোখে পরবে যে, জামাতে আহমদীয়া এত উন্নতি করবে যে, তখন অন্যান্য জাতির অবস্থা এবং অবস্থান খুবই নগন্য হবে কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টি ও সঞ্চারিত করতে হবে যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এ দৃশ্য আমাদের উপহার দিবেন। যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন এসে থাকে সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামাতের সাথে সব সময় এমনটি হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

কয়েক দিন পূর্বে রাবওয়াতে তাহরীক জাদীদের অফিসে এবং জিয়াউল ইসলাম প্রেসে সরকারী পুলিশের বিশেষ প্রতিষ্ঠান যাদেরকে কাউন্টার টেরোরিস্ট অর্থাৎ যে সেল গঠন সন্ত্রাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য এবং তাদের নির্মূল করার জন্য গঠন করা হয়েছে। তারা দু'জন মুরব্বী এবং কিছু কর্মীকে আটক করেছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাবওয়া থেকে কিছু মানুষ আমার কাছে পত্র লিখেছেন, যাদের মাঝে মহিলাও রয়েছেন।তারা বলেন, আমরা এ সব কথায় ভয় পাই না। বরং এর ফলে আমাদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়েছে। আমাদের ঈমান দৃঢ় আছে এবং সব সময় দৃঢ়তা লাভ করে আর আমরা সকল সমস্যা মোকাবেলা করব এবং ত্যাগ স্বীকার করব।এটি সেই প্রকৃত চেতনা এবং প্রেরণা যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এ সব বিষয় সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের এমন কুরবানী দিতে হবে। খোদার প্রতিশ্রুতি এবং অশেষ সাহায্য সমর্থনের নিদর্শনাবলী আমরাদেখি। নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিজয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতেরই। বিরোধিতা হয় এবং হবেও।এরা হতভাগা যারা হামলা করে বা হানা দেয় তাদের সবচেয়ে বড় ভয় এবং ত্রাস আহমদীদের পক্ষ থেকে বলে মনে হয়। কেননা আহমদীরা বলে হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি কর, খোদাকে ভয় কর। আহমদীরা খোদা সম্পর্কে মানুষকে সাবধান এবং সতর্ক করে এবং বলে, খোদার শাস্তিকে ভয় কর এবং সাবধান হও। এদের মতে আহমদীরা এমন কথা কিভাবে বলতে পারে? এরা খোদা সম্পর্কে আমাদের ভয় দেখায়! এরচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আর কে আছে, যে খোদার বিষয়ে আমাদেরকে ভয় দেখায়। তাই এদেরকে ধর আর খতম কর।

খোদা এদেরকে কান্ডজ্ঞান দান করুন। এদেরকে বোধবুদ্ধি দিন, বিবেক বুদ্ধি দিন। দেশকে এ সব মৌলভীদের থাবা থেকে রক্ষা করুন যারা প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসী, যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। কোন প্রাণ এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এই যে বিশেষ পুলিশ, সন্ত্রাস দমনকারী পুলিশ, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা সৎসাহস দিন যেন শান্তিপ্রিয় এবং দেশ প্রেমিক, দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আহমদীদের ওপর হাত উঠানোর পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক, তাদেরকে গ্রেপতার করুক, যাদের হাত থেকে জনসাধারণের জীবন নিরাপদ নয় এবং যারা দেশের মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে। আর তাদেরকেও যারা দুই হাতে দেশের সম্পদ লুটপাট করছে। আহমদীদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের সুরক্ষা করুন।এ সমস্ত অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করুন। কুরবানীর যতটুকু সম্পর্ক আছে আহমদীরা কুরবানী দিয়ে থাকে,

দিয়ে যাবে। এ সব কুরবানী ইনশাআল্লাহ্ অচিরেই ফল বহন করবে।

অনুরূপভাবে আলজেরিয়াতেও আহমদীদের ওপর অনেক যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে। খোদা তা'লা তাদেরকেও নিরাপদ রাখুন। তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা দৃঢ় চেতা বানান এবং অবিচলতা দান করুন। সেখানকার সরকারকে আল্লাহ্ তা'লা কান্ডজ্ঞান দিন। তারাও যেন আহমদীয়াতের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে, এরা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ! এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আমরা করব, ইনশাআল্লাহ্।

পুনরায় আমরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্বৃতির দিকে ফিরে আসছি, তিনি বলেন, পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিরোধিতা অংশীদারদের হয়ে থাকে। পাঞ্জাবীতে প্রসিদ্ধ আছে, নিজের অংশ কষ্ট করে হলেও আদায় করতে হবে। তো সবচেয়ে বড় বিরোধিতা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। তারা সহ্যই করতে পারে না যে, তাদেরমধ্যে থেকে দন্ডায়মান হয়ে এক ব্যক্তি পৃথিবীতে বড় হবে। আর সম্মান লাভ করবে। তার প্রতিদ্বন্দীতায় এই বস্তুজগতের প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে, তারা কিভাবে সহ্য করতে পারে যে, সারা পৃথিবী তাঁর দারস্থ হবে। তাই তারা তাকে দমনের সকল চেষ্টা করে। এমনকি যারা কিছুই করে উঠতে পারে না তারাও কোন না কোনভাবে হৃদয়ের লালিত বিদ্বেষ প্রকাশের চেষ্টা করে।তিনি বলেন, খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, শাহ্ কোটের রঈসদের কোন একজন যখন খান বাহাদুর উপাধি লাভ করে, এক রঈস খান বাহাদুর উপাধি লাভ করার পর সেই বংশের এক মহিলা যে খুবই দরিদ্র ছিল তার ছেলের নাম রাখে খান বাহাদুর। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এটি কী করলে, এই নাম রাখার কারণ কী? সে বললে, জানি না আমার ছেলে বড় হয়ে কী হবে, কিন্তু মানুষ যখন নাম নিবে তার অংশীদারকে যেভাবে খান বাহাদুর বলবে অনুরূপভাবে আমার ছেলেকেও খান বাহাদুর বলেই ডাকবে। এই হল অবস্থা, যাদের জন্য অন্য কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠে না তারা অন্তত পক্ষে অনুরূপ নাম ধারণের অপচেষ্টা করে।তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তি ইমাম হওয়ার দাবি করে বসে। (গেতিগোষ্ঠির কথা হচ্ছে।) আত্মীয়-স্বজন ভাবল তিনি দাবি করেছেন, মানুষ তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, আমিও দাবি করি।হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ফার্সীর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা ধারা তার নিজের মানসিক এবং জ্ঞানগত যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দাবি করেছিলেন যে, আমিই সারা বিশ্বের জন্য হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে এসেছি। কেবল ছোট লোকদের জন্যই নয় বরং বড় বড় বাদশাহ্দের জন্যও আমার অনুসরণ বা আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু তাঁর যে দ্বিতীয় আত্মীয় ছিল তার তো শুধু নামটাই রাখা বাকি ছিল, যে আত্মীয় দাবি করেছে সে মেথরদের ইমাম হওয়ার দাবি করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করে এটিও লিখেছেন যে, ইংল্যান্ড-এর বাদশাহ্র জন্য আমাকে মানা আবশ্যক। নিজেই লিখে তখন রানীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মেথরদের ইমাম হওয়ার দাবিকারকের সৎসাহস এবং তার মান্যকারীদের অবস্থা দেখুন। এখানে ওসী যখন জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কোন দাবি করেছ? সে বলে, না, আমি কোন দাবি করি নি। কেউ এমনিতেই মিথ্যা রিপোর্ট করেছে। অতএব, তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় বিরোধিতা হয়ে থাকে জ্ঞাতি-গোষ্ঠির পক্ষ থেকে।

(খুতবাতে মাহমদু ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯)

আত্মীয়-স্বজন যখন বিরোধিতা আরম্ভ করে, বিরোধিতা চরম রূপ ধারণ করে, সকল বৈধ অবৈধ পদ্ধতিতে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এটি উল্লেখ করার পর তিনি বলেন, আমাদের বেশ কয়েক ডজন এমন আত্মীয়-স্বজন আছে যারা আহমদীয়াতের কারণে আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। এই কারণে নয় যে, আমরা তাদের সাথে মেলামেশা করা পছন্দ করতাম না। বরং তারা আমাদের সাথে মেলামেশা রাখতে চাইত না। আমাদের বংশের মানুষ আমাদের গালি দিত। আমাদের জ্যাঠি সাহেবা যিনি পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন আমাদের অনেক আজে-বাজে কথা বলতেন। আমার মনে আছে, একবার যখন আমার বয়স ছয় বা সাত হবে তখন আমি সিড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীতে বারবার বলেন, যেমন কাক তেমন কাকের ছানা। আর তিনি এ বাক্যটি এতবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, আমারা মুখস্থ হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এর অর্থ কী? আমাকে জানানো হয়, তোমাকে বলা হয়েছে, যেমন তোমার বাবা হীন তুমিও তেমনই। তিনি বলেন, কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বয়কট করা হয়েছে। তাঁর ঘরে কাজ করতে দেওয়া হতো না মানুষকে, কুমারদের বাধা দেওয়া হতো, মেথরদের পরিস্কার করার কাজ করতে দেওয়া হতো না। আমাদের প্রিয় ভাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর ভাবী এবং অন্যান্য প্রিয় আত্মীয়-স্বজন এমনকি তাঁর মামাত ভাই আলীশের, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিত।তিনি বলেন, একবার গুজরাতের কিছু বন্ধু, যারা সাত ভাই ছিল, কাদিয়ান আসে, বাগানের দিকে যায় এই উদ্দেশ্যে যে, তা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাগান দেখতে গিয়েছে। পথিমধ্যে আমাদের এক আত্মীয় বাগান করছিল। সেই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে এসেছ, আর আসার কারণ কী? গুজরাত থেকে আগত অতিথিরা বলেন, গুজরাত থেকে এসেছি, হযরত মির্যা সাহেবের খাতিরে এসেছি। সেই ব্যক্তি বলে, দেখ! আমি তাঁর মামাত ভাই, আমি খুব ভাল করে জানি, সে এমন আর এমন। তাদের একজন যে সবার সামনে ছিল সে সামনে অগ্রসর হয়ে তাকে জাপটে ধরে এবং তার বাকি ভাইদের ডাকতে থাকে যে, তাড়াতাড়ি আস। সেব্যক্তি এতে ভয় পেয়ে যায়, তখন সে আহমদী বলে, আমি তোমাকে মারব না কারণ, তুমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয়। আমি আমার ভাইদেরকে তোমার চেহারা দেখাতে চাচ্ছিলাম। কেননা আমরা শুনতাম যে, শয়তান দেখা যায় না। কিন্তু আজকে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে, সে এমন হয়।

(দৈনিক আল-ফযল, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৫ থেকে সংকলিত)

এরপর তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, তুমি ছাড়া এই বংশের বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হবে। বিরোধিতা হয়েছে, সবকিছু হয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, এই বংশধারা তোমার মাধ্যমেই সূচিত হবে। বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হবে। এমনই হয়েছে। এখন এই বংশের কেবল তারাই অবশিষ্ট আছে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। বাকি সবার বংশধারা কর্তিত হয়েছে। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন তখন এই বংশে ৭০ এর কাছাকাছি পুরুষ ছিল। কিন্তু এখন যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৈহিক বা আধ্যাত্মিক সন্তান তারা ব্যাতীত বাকি ৭০জনের একজনেরও কোন সন্তান নেই। অথচ তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম মিটিয়ে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আর নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? ফলাফল হল, তারা নিজেরাই নিঃচিহ্ন হয়েগেছে, তাদের বংশধারার সমাপ্তি ঘটেছে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক অসাধারণ নিদর্শন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯ থেকে সংকলিত)

জ্যাঠি সাহেবার বয়আতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শন আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হয়ে থাকে। কিন্তু সেগুলোর অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলে তাতে এমন অনেক কথা থাকে যা অসাধারণভাবে ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, এটি আমি গতকালই জানতে পেরেছি। যদিও তা সেই ব্যক্তি এবং তার নিজের অবস্থা সংক্রান্ত কিন্তু এতে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে। কয়েক বন্ধু বলেছেন, তারা পূর্বেই জানত কিন্তু আমি গতকালই জেনেছি। গতকাল জ্যাঠি সাহেবার মৃত্যুর সময় শেখ ইয়াকূব আলী সাহেব বলেছেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরনো একটি ইলহাম আছে আর তা হল,'তাঈ আঈ'। অর্থাৎ জ্যাঠি এসেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্যাঠি ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় ভাইয়ের স্ত্রী।, তাঁর ভাবী। অতএব, তিনি (রা.) বলেন, একটি পুরনো ইলহাম হল, জ্যাঠি এসেছেন। এ সম্পর্কে প্রবীণ আহমদীরা বলেন, তখন এর অর্থ বোঝা কঠিন ছিল। কেউ কিছু বলত, কেউ ভিন্ন কথা বলত। কিন্তু এ বাক্যের সোজা সরল অর্থ হবে, এমন কোন মহিলা যার সাথে জ্যাঠির সম্পর্ক থাকবে তিনি আসবেন। আসার দু'টো অর্থ থাকতে পারে, কাছে আসা বা জামাতভুক্ত হওয়া। শুধু আসার কথা, এটি কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন তো এসেই থাকে। আমাদের এখানে বড় সবাই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবীকে জ্যাঠি হিসেবেই ডাকত, যেন তার নামই ছিল জ্যাঠি। জামাতের বই-পুস্তক যারা পাঠ করে তারা জানে মোহাম্মদি বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যুগে তিনি ভীষণবিরোধী ছিলেন, অর্থাৎ জ্যাঠি সাহেবা। তিনি বংশে সবচেয়ে বড় ছিলেন। আর ভবিষ্যদ্বাণীও তার বোনের পুত্র সংক্রান্ত ছিল। তাই বংশের নেতা হওয়ার দিক থেকে এই সম্পর্কের পথে বাধ সাধা নিজের জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করতেন,কেননা তার মতে এটি তার বংশের জন্য অসম্মানের কারণ ছিল। তিনি মনে করতেন, তার দৃষ্টিতে বিরোধিতা করা তার গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহিলাদের প্রকৃতির দিক থেকে বড় মহিলার জন্য সম্মান এবং পারিবারিক মান-সম্মান সব ধর্মীয় বিষয় বরং সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অবস্থার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মসীহ্ হওয়ার দাবি তখন ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যতটা পারিবারিক সম্মান গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এমনিতেও জৈষ্ঠ্যদের জন্য ছোটদের আনুগত্য করা কঠিন আর মসীহ্ মওউদ (আ.) জ্যাঠি থেকে ছোট ছিলেন আর সম্পত্তির অংশও নেন নি। তিনি অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পত্তির অংশও নেন নি, তাই তাঁর পানাহারের ব্যবস্থাও তার ঘর থেকেই হত অর্থাৎ জ্যাঠির ঘর থেকেই হত। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি মনে করতেন, আমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর অনুগ্রহ করছি। মহিলাদের ভিতর প্রকৃতিগতভাবে এমন ধ্যান-ধারণা থেকেই থাকে, তাই তিনিমনে করতেন, মসীহ্ মওউদের ওপর আমি করুনা করছি। তিনি তাঁর সম্পত্তি নেন নি, সম্পত্তি সব তারই কাছে- এ কথাচিন্তা করতেন না বরং ভাবতেন, আমি খাবার পাঠাই, খাওয়াই এবং ব্যয়ভার বহণ করি, তাই তিনি মনে করতেন, তাঁর উপর আমি করুনা ও অনুগ্রহ করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ তাঁর এক আরবী পঙক্তিতে

বলেন,

لُفَاظَاتُ الْمَوَائِدِ كَانَ أُكْلِيْ وصِرْتُ الْيَوْمَ مِطْعَامَ الْأَهَالِيْ

এর অর্থ হল: এক যুগ এমন ছিল যখন আমি অন্যদের পরিত্যক্ত রুটির টুকরো খেয়ে দিনাতিপাত করতাম কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে এখন এমন মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন যে, সহস্র সহস্র মানুষ আমার দস্তরখানে পেটপুরে খায়।এই পঙক্তিতে এ ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পত্তি পৃথক ছিল না। ভাই-এর কাছেই ছিল আর তাঁর ভিতর তা দেখা-শোনার কোন মনোবৃত্তিও ছিল না। তাঁর পিতা বলতেন, তিনি সম্পত্তি সামলাতে পারবেন না। এমতাবস্থায় শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠির ঈমান আনা বড় কঠিন বিষয় ছিল, তিনি পরে বয়আত করেছেন।হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলছেন , যুক্তি-প্রমাণ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। উভয়ের অবস্থা মালিক এবং চাকরের ন্যায় ছিল, শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠি নিজেকে মালিক মনে করতেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নাউযুবিল্লাহ চাকর মনে করতেন। তাঁকে দরিদ্র এক মানুষ মনে করতেন যিনি কোন কাজ করতেন না আর তাদের দেয়া খাবার খেয়ে দিনাতিপাত করতেন, এমতাবস্থায় তিনি তার বোনের মেয়ের সাথে বিয়ে করতে সফল হবেন এটি তার জন্য ছিল অসহ্য। তিনি যেহেতু সবচেয়ে বড় ছিলেন তাই তার বিরোধিতা ছিল বিশেষমাত্রার।সেই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভয়াবহ বিরোধিতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন তাঁর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিল আর তিনিও তাদের সাথে মেলামেশা রাখতেন না বরং বংশের বিরোধিতার চিত্র হল, আমার মা বলতেন [অর্থাৎ, হযরত আম্মাজান (রা.) বলতেন], হযরত সাহেবের নানার বংশে এক প্রবীণ মহিলা ছিলেন তিনি বলতেন,আমাকে কেউ চেরাগ বিবির ছেলেকে দেখতেও দেয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চোর এবং ডাকাতদের মত পৃথক রাখা হত আর মনে করা হত, তিনি বংশের জন্য কলঙ্ক। এমতাবস্থায় এটি ধারণা করা যে, জ্যাঠি আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন, বাহ্যত এক অসাধারণ বিষয় ছিল। মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হতে পারে কিন্তু দেখার বিষয় হল পরিস্থিতি কেমন ছিল? এমন পরিস্থিতে তাঁর প্রতি ইলহাম হয়, 'জ্যাঠি এসেছেন'। শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন তাই এই শব্দগুলোর অর্থ হল, তিনি তখন বয়আত করবেন যখন বয়আতকারীর সাথে তার সম্পর্ক হবে জ্যাঠির। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে যদি বয়আত করার থাকত তাহলে ইলহামের শব্দ হত 'ভাবী এসেছেন'। তিনি মসীহ্ মওউদের ভাবী ছিলেন। যদি খলীফা আউয়ালের হাতে বয়আত করার থাকত তাহলে ইলহাম হত মসীহ্ মওউদের 'বংশের এক মহিলা এসেছেন' কিন্তু জ্যাঠি শব্দ বলছে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র যখন তাঁর খলীফা হবেন তখন তাঁর হাতে তিনি বয়আত করবেন। কেননা, তাঁর সন্তানদের কারো যদি খলীফা নাই বা হওয়ার থাকত তাহলে 'জ্যাঠি' শব্দ বৃথা।তিনি বলেন, ইলহামে সত্যিকার অর্থে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্নিহিত আছে। প্রধানত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানদের মাঝে কেউ খলীফা হবেন, দ্বিতীয়ত শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠি তখন আহমদীয়ত গ্রহণ করবেন, তৃতীয়ত জ্যাঠি সাহেবার বয়স সংক্রান্ত ইলহাম এটি। আর এটা এভাবে পূর্ণতা লাভ করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বয়স যখন প্রায় ৭০ বছর তখন এমন এক ভদ্র মহিলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যিনি তখনই বয়সে তার চেয়ে বড় ছিলেন তথাপি তিনি জীবিত থাকবেন এবং তাঁর বংশ থেকে এক খলীফা হবে, যার হাতে তিনি বয়আত করবেন। এত দীর্ঘ জীবন লাভ করা অনেক বড় কথা। মানবিয় চিন্তাধারা কোন যুবক সম্পর্কেই বলতে পারে না যে, সে এত দিন জীবিত থাকবে তখন বৃদ্ধা সম্পর্কে কিভাবে বলা যাবে? শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠি সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্তেকাল করেন। অতএব এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন যেন তার বয়আত করা আর আমার যুগে বয়আত করা আর মসীহ্ মওউদের পুত্রদের মধ্য থেকে কারো খলীফা হওয়া বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এতে অন্তর্নিহিত আছে যা দুই শব্দের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে। জ্যাঠি আহমদীয়ত গ্রহণের পর ওসীয়্যতও করেছিলেন। আর এর পটভূমি বড় বিস্ময়কর।তিনি বলেন, আমি মনে করি, যেমন ঐতিহ্য এবং আবেগ অনুভূতি পুরনো পরিবারগুলোতে পাওয়া যায় সেই দৃষ্টিকোন থেকে এটি এক অসাধারণ পরিবর্তন যে, শ্রদ্ধেয়া জ্যাঠি বয়আত করার পর ওসীয়্যতও করেছেন। শুধু বয়াআতই করেন নি বরং ওসীয়্যতও করেছেন। প্রথমে তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্যত্র দাফনের বিরোধী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর তখনই তিনি সংবাদ পাঠান, তাঁকে যেন পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্য স্থানে দাফন করা না হয়, কেননা এটি এক ধরণের অসম্মান। আর এরপরও বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে আপত্তি করে বেড়াতেন কিন্তু তার নিজের অবস্থা দেখুন, এরপর ওসীয়্যত করেন আর বেহেশতী মাকবেরায় কবরস্ত হোন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। আপাত দৃষ্টিতে এটি তুচ্ছ একটি বিষয় যা এক ব্যক্তি সংক্রান্ত কিন্তু এতে সত্যতার বেশ কিছু দিক অন্তর্নিহিত আছে। (খুতবাতে মাহমুদ, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১-২৫৩ থেকে সংকলিত) বিরোধিতা সত্ত্বেও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল যে, পৈত্রিক কবর স্থানে তাকে দাফন করা উচিত কিন্তু পরে তিনি ওসীয়্যত করেন এবং তিনি নিজেও বেহেশতী মাকবেরাতে কবরস্ত হোন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিল্লি সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, "মানুষ যখন আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে সে কখনও ঐশী কার্যক্রম সম্পর্কে এ চিন্তা করে না যে, এর কী ফলাফল প্র কাশ পাবে না। আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ও নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছেন আমি তখন ছোট ছিলাম। [দিল্লির জামাতকে সম্বোধন করে বক্তৃতা করছেন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)] তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছেন আমি তখন ছোট ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানকার ওলী উল্লাহদের মাজারে যান আর দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করেন আর বলেন, আমার দোয়া করার করণ হল, এসব বুযূর্গে র আত্মা যেন উদ্বেলিত হয়, কোথাও এমন যেন না হয় যে, তাদের সন্তানসন্ততি সেই নূর থেকে বঞ্চিত থাকবে যা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে তাদের হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, নি:সন্দেহে একদিন এমন অবশ্যই আসবে যখন আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয়কে খুলে দিবেন। তারা সত্য গ্রহণ করবে।তিনি বলেন, তখন যদিও আমি ছোট ছিলাম কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথার প্রভাব এখনও আমার হৃদয়ে বিদ্যমান। অতএব, এখানকার জামাত যদি নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ভাল ফলাফল দেখতে চায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করা উচিত। অবশ্যই একদিন এমন আসবে, কেননা যে বিষয়কে খোদা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা অবশ্যম্ভাবী।" (আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪) দিল্লি জামাতের একটি ভাষণে একটি উত্তরে তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন।

অতএব, আজও দিল্লি জামাতের জন্য আবশ্যক হবে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচার করা। মাশাআআল্লাহ্! প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে তবলীগে অনেক গতি সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও রয়েছে তাই তাদের মাঝেও এই বাণী প্রচারের অসাধারণ আবশ্যকতা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দোয়া, এদিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন।

একই প্রসঙ্গে মুসলেহ্ মওউ দ (রা.) আরো বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি স্বপ্নে দেখেন, একটি দীর্ঘ ড্রেইন খোদাই করা আছে এবং তাতে বেশ কিছু ভেড়া শোয়ানো হয়েছে, প্রতিটি ভেড়ার সামনে এক কশাই ছুরি নিয়ে জবাই-এর জন্য প্রস্তুত আর তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে যেন তারা কোন নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, আমি তখন সেখানে পায়চারি করছিলাম, তাদের কাছে আমি গিয়ে বলি قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (আল ফুরকান: ৭৮) তখনই তারা ছুরি চালায়। সেই ভেড়াগুলো যখন ছটফট করছিল তখন যারাছুরি চালিয়েছিল তারা বলে, তোমরা মল ভক্ষণকারী ভেড়া ছাড়া আর কিছু ই তো নও।হযতর মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দিনগুলোতে সত্তর হাজার মানুষ কলেরায় প্রাণ হারায়। অতএব, কেউ যদি কর্ণপাত না করে আল্লাহ্ তা'লা তার ভ্রুক্ষেপ করে না, আল্লাহ্‌র কাজ ব্যহত হতে পারে না, তা অবশ্যই সফলতার দার প্রান্তে পৌঁছবে।তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনশত বছর পর খ্রিষ্টধর্ম উন্নতি করে কিন্তু আমাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, হযরত ঈসা (আ.)-এর জাতির যুগের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্।

(আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৩-৮৪)

পাকিস্তানী মৌলবী হোক বা কোন ধর্মীয় নেতা অথবা কোন জাগতিক শক্তি খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই, তারা ভেড়ার পালের মত মানুষ। এরা কখনও আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না। কাজেই আহমদীয়তের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কেবল আমাদের মুবাল্লেগদের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। উন্নতির অংশ হতে চাইলে আহমদীয়াতের প্রচার করুন। আর অবশ্যই আমাদেরকে এর অংশ হতে হবে। অতএব, আমাদের উচিত দোয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া। আধ্যাত্মিকতার উন্নতি আবশ্যক। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা আবশ্যক, এ বিষয়গুলোই আহমদীয়তের বিরোধিতার সমাপ্তির কারণ হবে আর আহমদীয়তের উন্নতির ক্ষেত্রে আমাদেরও অবদান থাকবে ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর এক ভাই-এর গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি জনাব সুফনি জাফর আহমদ সাহেবের জানাযা, ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লেগ। গত ৮ই নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল ৭১ বছর। ১৯৪৫ সনের ২৮ আগষ্ট সুমাত্রার পারাঙ-এ তার জন্ম হয়। তার পিতা জেনে জালাম সাহেব ১৯২৩ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে জামাতভুক্ত হোন। তিনি আরো দুইজন যুবকের সাথে সম্মিলিতভাবে সুমাত্রা এবং জাভায় তবলিগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তার পিতা সুফনি সাহেবের পিতা ইন্দোনেশিয়ার প্রথম যুগের মুবাল্লেগদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। জেনে জালাম সাহেবের তিন সন্তান ছিল। সুফনি জাফর সাহেবকে ওয়াকফ করার পর

এর পর বারোর পাতায়...

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 19th Jan, 2017 Issue No. 3

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

"হাসিমুখে নিজের কাজ করে যান এবং অতিথির সঙ্গে কোন প্রকারের গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকুন"

জলসা সালানা কানাডা উপলক্ষ্যে ৬ই অক্টোবর ২০১৬ তারিখে কর্মীদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

(প্রথম ভাগ)

হুযুর আনোয়ার তাশাহুদ তাঊয ও তাসমিয়া পাঠের পর বলেন: আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ঐ সকল দেশে যেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সেখানে জলসাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং জলসার ব্যবস্থাদির জন্য ডিউটি প্রদানের জন্য স্বেচ্ছাসেবীও থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঐ সকল জামাতগুলিতে যেখানে দীর্ঘ সময় যাবৎ জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার কর্মীরাও নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেছেন। একাজে তারা বিশেষ দক্ষতাও অর্জন করে ফেলেছেন।

বিভিন্ন জলসার সময়, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য বা কোন কোন স্থানে যেখানকার জলসায় আমি নিজে অংশ গ্রহণ করি সেখানে কর্মীদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখি। আল্লাহ্র কৃপায় এম.টি.এ-র মাধ্যমে সর্বত্র সেই বার্তা পৌঁছেও যায়। এই কারণে যতদূর উপদেশাবলীর সম্পর্ক, যদি আপনারা সমস্ত কর্মী, এম.টি.এ-র সঙ্গে সম্পর্কে থাকেন এবং শুনে থাকেন তবে প্রত্যেকেরই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে যাওয়া উচিত। যাইহোক স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে এ সম্পর্কে কিছু কথা উল্লেখ করা আল্লাহ্ তা'লারই আদেশ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জলসার সম্পর্কে আপনাদের সকলকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যে খিদমতের জন্যই আপনারা নিজেকে উপস্থাপন করে থাকুন না কেন, এক্ষেত্রে আপনাদের উপর কোন জোর ছিল না, বরং আপনারা সাগ্রহে নিজেদেরকে পেশ করেছেন। এই কারণে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের আপনারা খিদমত করতে পারেন। মানুষের নিজের বাড়িতে যদি অতিথি আসে তবে সে সাধ্যমত অতিথি সৎকার করে। এমন এক ব্যক্তি যিনি আমাদের সকলের প্রিয় তিনি জামাতকে বিশেষভাবে অতিথি সেবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ সকল অতিথিদের সেবার প্রতি যারা ধর্মের উদ্দেশ্যে সুদূর পথ অতিক্রম করে জলসায় উপস্থিত হন। সুতরাং তাদের এই সেবা কীরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা সহকারে করা উচিত তা নিজেরাই অনুমান করে দেখুন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যতদূর ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক, যদিও আমি দীর্ঘকাল পর এখানে জলসায় এসেছি তথাপি আমার অনুমান কানাডা জামাতের কর্মীরা যারা জলসায় খিদমত করে তারা নিজেদের কাজে এতটা দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছে যে প্রত্যেকটি কাজ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে সম্পাদন করবে। ইনশাল্লাহ। আমি তাদের কাছে এই আশাই করি। কিন্তু কখনো কখনো নতুন কর্মীরাও এসে থাকে। বিগত কয়েক বছরে পাকিস্তান থেকে অনেকে এসেছেন। যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখান থেকে আসা কর্মীদেরকে জলসার কাজে খুবই দক্ষ মনে করা হত, বিশেষ করে রাবওয়াবাসীদেরকে। কিন্তু বিগত প্রায় ৩৩/৩৪ বছর থেকে সেখানে জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি এবং সেই সময় যারা কর্মী ছিল তাদের একটি প্রজন্ম বয়োঃবৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। যারা বয়স্ক ছিল তারা হয়তো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। সেই সময় যারা শিশু বা কিশোর ছিল তারা এখন যৌবন অতিক্রম করে আনসার হয়েছে। এই কারণে তাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। যদিও রাবওয়াতে প্রতি বছর, বরং বছরে কয়েক বার ডিউটি লাগানো হয় এবং এই সব কর্মীদের বিশেষ করে লঙ্গর খানা পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যাতে আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতে যখনই পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাবেন তখন সেখানে যেন কর্মীদের এমন প্রশিক্ষণ অর্জন হয়ে থাকে যে নিজেরাই সমস্ত কাজ পরিচালনা করতে পারে। যাইহোক একটি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করা, অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কোন কাজ সম্পাদন করা এবং বাস্তবে অতিথিদেরকে সামনে রেখে তাদের সেবা করা ভিন্ন বিষয়। কিছু ছেলে যুবকে পরিণত হয়ে কর্মী হয়েছে। কিছু নবাগত আছে যারা কর্মী হিসেবে কাজ করছে। এই সমস্ত নবাগতদের উদ্দেশ্যে আমি বলব যে, জলসায় যেখানেই আপনার ডিউটি লাগানো হোক, আপনাদের প্রত্যেকেই সর্ব প্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন সেটি হল উত্তম আচরণ প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভালভাবে সকলের সঙ্গে মিলিত হবেন। ডিউটিরত প্রত্যেকেরই কিছু জটিলতার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিছু মানুষ আছে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে বাগ-বিতন্ডা করার চেষ্টা করে। কিছু মানুষ আছে যারা কর্মীদেরকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করবে। এমন পরিস্থিতিও সামনে আসে যখন মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন আহমদী কর্মীকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তার উত্তম আচরণ ও নৈতিকতা যেন সর্বদা বজায় থাকে। কারোর কোন আচরণ তার উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকতা এবং উত্তম আচরনকে যেন ছিনিয়ে না নিতে পারে। উত্তম আচরণের মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হল সর্বদা হাসিমুখে, এমনটি কঠিন সময়েও হাসিমুখে থেকে নিজের কাজ করে যাওয়া এবং অতিথির সঙ্গে কোন প্রকারের গর্হিত আচরণ না করা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: যারা স্বেচ্ছসেবী ও কর্মী রয়েছে তারা নিজেদের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের কাছে কোন বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আধিকারিকগণ নিজেদের আমীরকে সে বিষয়ে অবগত করতে পারেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি এই ধরণের অসভ্যতা করছে। যাতে তরবীয়ত বিভাগ তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। কিন্তু সরাসরি কোন প্রকারের ঝগড়া হওয়া উচিত নয়। সে ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাজে নিযুক্ত কর্মী হোক, বিশেষ করে গাড়ির যখন ভিড় হয়। এখন তো গাড়ির সংখ্যা আরও বেড়েছে। অনেক ভিড় জমে যায় সেখানে। ট্রাফিককে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, এবং তাদেরকে সঠিক স্থানে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। জায়গা না থাকলেও অনেকে নিজের গাড়ি জোর করে ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে তাদেরকে নম্রভাবে বোঝান। এরপরেও যদি কেউ আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তবে সে বিষয়ে উচ্চ পদস্থ অফিসারকে অবগত করুন। যাতে তরবীয়ত বিভাগ তাদেরকে বোঝায় এবং সংশোধন করার চেষ্টা করে।

(ক্রমশঃ)

এগারোর পাতার পর....

পড়ালেখার জন্য জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পাঠান, সুফনী জাফর আহমদ সাহেব ১৭ জুলাই ১৯৬৩ সনে রাবওয়ায় আসেন, প্রায় ১১ বছর রাবওয়ায় অবস্থান করেন। জামেয়া আহমদীয়ায় পড়া লেখা করেন। ১৯৭৪-এ পড়ালেখা শেষ করে ইন্দোনেশিয়া ফিরে যান সেখানে তার প্রথম পোষ্টিং হয় কালে মুমতানে, ইন্দোনেশিয়া। এরপর পশ্চিম জাভায় আঞ্চলিক মুবাল্লেগ ও আমীর হিসেবে জামাতের কাজ করার তৌফিক পান। পরে পূর্ব জাভা এবং পাপওয়াতে কাজের সৌভাগ্য হয়। ১৯৮৫ থেকে ৮৭ পর্যন্ত জাম্বিতে, ৮৭ থেকে ৯১ পর্যন্ত উত্তর সুমাত্রায় আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়ায় ফিকাহর শিক্ষক হিসেবে ফিকাহ পড়ানোর সৌভাগ্য হয়। তরবিয়ত নও মোবাঈনের দায়িত্বও তার ওপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত লাম্পুঙ্গে আঞ্চলিক মুবাল্লেগ নিযুক্ত হোন। তার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি মসজিদ এবং মিশন হাউসের নির্মানের কাজও করেন। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় নিম্নলিখিত চারটি পুস্তিকা লেখার সৌভাগ্য হয়েছে তার। যাকাতের দর্শন, আল্লাহ্র পথে ত্যাগ স্বীকার, জানাযা এবং ইসলামে জিহাদের অর্থ। এই চারটি পুস্তক তিনি লিখেছেন। ২০০১ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন থেকে বিভিন্ন রোগে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। খিলাফতের সাথে সুগভির বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ জামাতের খাদেম ছিলেন। পরিবার পরিজনে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্র তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। পিতার মত পুণ্যে অগ্রগামী, বিশ্বস্ততা প্রদানকারী এবং আমলে উন্নত আহমদীতে পরিণত করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir